সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি

আবদুল ওয়াহেদ সিদ্দিকী

আবদুল ওয়াহিদ সিন্ধী

সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি

মুহাম্মদ হাসান রহমতী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি
আবদুল ওয়াহিদ সিন্ধী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাসান রহমতী

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৫৪/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৫৯.০২৯৭
ISBN : 984-06-0237-3

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮৪

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ১৯৯৪
আষাঢ় ১৪০১
যিলহজ্জ ১৪১৫

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা - ১০০০

প্রচ্ছদ
হাসান সাইয়ীদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা - ১০০০

মূল্য ঃ ৪৮.০০ টাকা মাত্র

SONALI JUGER MUSLIM NOUSHAKTI : Muslim Naval Force of the Golden Age, translated from Urdu by Muhammad Hasan Rahmati and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.

Price : Tk. 48.00 ; U S $: 2.50 June 1994

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের রয়েছে বিরাট ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথা। বিশ্বসভ্যতা মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-পণ্ডিতদের অবদানে সমৃদ্ধ। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম সে-সবের অনেক কিছুই জানে না। এক সময় বিশ্ব জুড়ে মুসলিম নৌ-বিজ্ঞানের তথা নৌ-শক্তির ছিল অপ্রতিরোধ্য প্রতিপত্তি। সে সব এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম গবেষক ও মনীষী আবদুল ওয়াহিদ সিন্ধী ইতিহাস ঘেঁটে মুসলমানদের সেইসব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে উদ্ধার করে বর্তমান বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর রচিত 'ইসলাম কি মশহুর আমীরুল বহর' নামক উর্দু গ্রন্থে। তারই বাংলা তর্জমা সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি। বাংলা তর্জমাকারী জনাব মুহাম্মদ হাসান রহমতী তাঁর নিপুণ তর্জমাকর্মের স্বাক্ষর রেখেছেন এই গ্রন্থে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই গ্রন্থ বর্তমান এবং ভবিষ্যতে প্রজন্মের সামনে এক জাতীয় গৌরবগাঁথা নিয়ে উপস্থিত। আমাদের জাতীয় জীবনে তা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ্‌কে অশেষ শুকরিয়া। তাঁর অপার করুণা আমাদের আত্মসচেতন হয়ে ওঠার তৌফিক দান করুন।

মহাপরিচালক

প্রকাশকের কথা

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের গৌরবময় অবদানের অনেক কিছুই আজ মুসলমানদের অজ্ঞতা এবং অন্যদের সচেতন চক্রান্তের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ মাত্র কয়েক শতক আগ পর্যন্তও বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানরা নেতৃত্বের আসনে ছিলো অধিষ্ঠিত। আজকের দিনের মুসলমান শুধু দুনিয়ার সর্বত্র অন্যদের হাতে পর্যুদস্তই হচ্ছে না, তারা অনেকে জানেও না যে, সভ্যতার বহুতর ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিলো বিস্ময়কর। সভ্যতার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় নৌবিজ্ঞানেও মুসলমানরা যে একদা যুগান্তকারী অবদান রেখেছিল বিখ্যাত গবেষক-লেখক আবদুল ওয়াহিদ সিন্ধী তা বিস্মৃতির অতল থেকে পুনরুদ্ধার করে তুলে ধরে আমাদের এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে যান। তাঁর সেই গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ 'সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি।' বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থখানির ভাষান্তর করে মুহাম্মদ হাসান রহমতী মুসলিম গৌরবগাঁথার এক হারানো অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিলেন। এজন্য অনুবাদককে আমরা জানাই আমাদের প্রাণঢালা মুবারকবাদ। এই গ্রন্থটির মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ বইটি তৃতীয় বারের মত প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

আজকের তরুণরা তাদের পূর্বসূরিদের এ মহান কীর্তিগাঁথা পাঠ করে পুলকিত-উল্লসিত হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাদের সেই উল্লাস সার্থক হবে যদি তারা নিজেরা তাদের মহান পূর্বসূরিদের অনুসরণে নিজেরাও পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবতর অবদান রাখার অভিযানে এগিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করে। আল্লাহ্ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আবারও সেই সোনালী যুগের পুনরাবৃত্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন। আমীন।

প্রকাশনা পরিচালক

অনুবাদকের কথা

ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে প্রতিটি মুসলিম-মুসলিমার জন্য অবশ্যম্ভাবী করেছে। তাই এক সময় তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরমোন্নতি লাভ করেছিলেন। ব্যাকরণ, সুকুমার সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, হাদীস, তাফসীর ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করেন। অভিধান ও জীবন-চরিত রচনা করেন। মননশীল ইতিহাস ও সুন্দর কাব্য রচনা করে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বারা মানবজ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করেন। দার্শনিক আলোচনা দ্বারা চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মুসলমানদের এই বিশাল পরিধিব্যাপী বুদ্ধিচর্চাদৃষ্টে চিন্তাশীল ঐতিহাসিক সেডিলট বলেছিলেন ঃ এ যুগের বিশাল সাহিত্য, প্রতিভার বহুমুখী স্ফুরণ ও মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ-এর প্রতিটিই অদ্ভুত জ্ঞানচর্চার স্বাক্ষর বহন করে এবং আরবগণ যে প্রতি বিষয়ে আমাদের প্রভু ছিলেন, তা যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করে। তারা একদিকে যেমন আমাদেরকে মধ্যযুগের ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ, ভ্রমণকাহিনী এবং চরিতাভিধান প্রণয়নের সুন্দর পদ্ধতি প্রদান করেছেন, অন্যদিকে অতুলনীয় শিল্প এবং কল্পনা ও রূপায়ণে সমভাবে চমকপ্রদ স্থাপত্য ও শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য আবিষ্করণ প্রদান করেছেন।

বস্তুত মুসলমানরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করছিলেন, তখন গোটা ইউরোপ ছিলো অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মুসলিম স্পেনে যখন প্রায় প্রতিটি নাগরিকই লিখতে-পড়তে জানতো, তখন খৃস্টান ইউরোপে পুরোহিতবর্গ ব্যতীত সকলেই, এমনকি উচ্চশ্রেণীর লোকগণও সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলো। তারা মুসলমানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে নিজেদের নাম-দস্তখতও করতে পারতো না। টিপসই দিয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতো। তাই একবার খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমান তাদের এহেন মূর্খতার প্রতি কটাক্ষপাত করে বলেছিলেন, যে জাতি স্বীয় নাম-দস্তখত করতে জানে না, তাদের সাথে আমাদের কোনো বাণিজ্য নেই। এরপর ইউরোপীয় খৃস্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের বিদ্যায়তনে লেখাপড়া শিখে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত ও আলোকপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক সেডিলট যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে আরব মুসলমানদেরকে প্রভু বলে অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় নৌ-বিজ্ঞান, সমুদ্র-বিজ্ঞানেও মুসলমানরা শীর্ষস্থানে ছিলেন। তারা দিক-নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার এবং নদনদী ও সাগর-মহাসাগরের মানচিত্র তৈরি করে জ্ঞানান্বেষণ ও বাণিজ্য ব্যপদেশে পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্রপথে ভ্রমণ করে বেড়ান। আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের সমুদ্রোপকূল ও মালয় উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এমনকি সুদূর চীনদেশও মুসলমান ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য তার রুদ্ধ দ্বার খুলে দেয়।

ওদিকে ভূমধ্যসাগরের অসংখ্য নৌবন্দর হতে বহু জাহাজ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য স্পেন, সিসিলী, ইটালী ও ফ্রান্সে পৌঁছে দিতো। বাইজান্টাইন রাজ্যের সাথে সরগরম বাণিজ্য ছিলো। পারস্য, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতেও তাদের অবাধ বাণিজ্য চলতো। পারস্যোপসাগর ছিলো প্রাচ্য দেশসমূহের নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ। হিন্দবাদ ও সিন্দবাদের কাহিনী এই নৌকেন্দ্রকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিলো।

কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, সাগর ও নৌযান আল্লাহ্‌র নি'মতসমূহের অন্যতম। যে-জাতি এই নি'মত করায়ত্ত করবে, তারাই বিশ্বজগৎ শাসন করবে। এই সময় মুসলমানরা আল্লাহ্‌র এই নি'মতটি করায়ত্ত করেছিলেন। সারা দুনিয়া তাঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলো। তাঁদের নৌ-ক্রিয়াকাণ্ডের দরুন ভূমধ্যসাগরের পানি সবসময় ঘোলা থাকতো। ভূমধ্যসাগর, মারমোরা সাগর, ঈজীয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগরে কোনো শক্তিই মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারতো না। ইউরোপীয় সম্মিলিত নৌবাহিনী তাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতো, যেমন করে পালিয়ে বেড়ায় ছোট ছোট পাখীরা বাজপাখীর ঝাপট থেকে। মুসলমানদের বিনা অনুমতিতে অন্য কোনো জাতিরই যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে পারতো না। মুসলিম নৌবহরগুলো সারা সাগরময় সর্বক্ষণ শিকার খুঁজে বেড়াতো এবং শত্রু জাহাজ দেখামাত্র ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো।

মুসলমানদের এই নৌ-দাপটে ভীত হয়ে শেষে ইউরোপীয় সওদাগরেরা প্রাচ্যদেশসমূহের সাথে নৌ-যোগাযোগকল্পে ভিন্নপথের অনুসন্ধান করতে লাগলো। সেই নৌপথের সন্ধানে বের হয়েই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন এবং ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার নিম্নাঞ্চল পার হয়ে ভারতে পৌঁছেন। বলা বাহুল্য, এই মহা আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও মুসলিম নাবিকের অবদানই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো।

মুসলমানরা বসফোরাস থেকে শুষ্কভূমির ওপর দিয়ে পাঁচ মাইল নৌ চালিয়ে কনস্টানটিনোপল জয় করেন। সিসিলী, সারদানিয়া, জেনোয়া, কাওসারা, মাল্টা, ক্রীট, সাইপ্রাসসহ ভূমধ্যসাগরের সমগ্র উপকূলীয় এলাকা এবং ইটালী ও ফ্রান্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। কনস্টানটিনোপল থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিস, সিরিয়া, মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য নৌবন্দর ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, একমাত্র তিউনিস কারখানায়

তৈরি যুদ্ধজাহাজেই সমস্ত ভূমধ্যসাগর ভরে যেতো। নৌ-শিল্পের উন্নয়নে মুসলমানরা বহু নৌবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বিদ্যালয়ে বহু কৃতী নাবিক, নৌসেনা ও আমীরুল বহর (এ্যাডমিরাল) সৃষ্টি হন। তাঁরা অনেক বড় বড় নৌ-অভিযান ও দেশজয় সাধন করেন। ইউরোপীয় বিশাল এলাকা অধিকার করে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে পারস্পরিক কলহ-কোন্দল ও বিলাসিতার দরুন মুসলমানদের নৌ-শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং ইব্‌ন খালদুনের মতে, এই শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম শক্তির ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

কাজেই মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস যে মূলত তাদের নৌ-উত্থান-পতনেরই ইতিহাস, তা দ্বিধাহীনভাবেই বলা চলে। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মুসলমানদের সে ইতিহাস আজ আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। তরুণ সমাজতো দূরের কথা, অনেক প্রবীণ বিদগ্ধজনও তা সম্যক ওয়াকিফহাল নন। আবদুল ওয়াহিদ সিন্ধী মুসলিম জাতির সেই বিস্মৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন তাঁর 'ইসলাম কে মশ্‌হুর আমীরুল বহর' নামক পুস্তকে। উর্দু ভাষায় লিখা এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের করাচী থেকে। আমার সংগৃহীত কপিটিতে লেখকের নিজস্ব কোনো ভূমিকা লিপিবদ্ধ নেই। তবে বইটি যে মুসলিম তরুণ সমাজকে উদ্দেশ্য করে লেখা তা তাঁর ব্যবহৃত ভাষা থেকেই বেশ প্রতীয়মান হয়। পুস্তকটিতে তিনি বিশ্ব নৌ-ক্রিয়ার সূচনা থেকে শুরু করে তুর্কী সালতানাতের অন্তকাল পর্যন্ত মুসলিম নৌ-কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ধারাক্রম সুবিন্যস্তরূপে বর্ণনা করেছেন এবং পরিশেষে সুবিখ্যাত মুসলিম আমীরুল বহরদের বীরত্বব্যঞ্জক বিজয়কাহিনী বিবৃত করে বিশেষভাবে মুসলিম তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রলুব্ধ করেছেন মুসলমানদের সেই সোনালী যুগের নৌশক্তি ফিরিয়ে আনতে। আজ দিকে দিকে ইসলামের নবজাগরণ শুরু হয়েছে। এই মঙ্গলময় মুহূর্তে বিষয়টির প্রতি বাংলাভাষী তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণহেতু আমি বইটি বঙ্গানুবাদ করেছি এবং তা প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ হাসান রহমতী

সূচী

এক

কুরআনে নদনদী ও নৌযান প্রসঙ্গ

আসমান-যমীনের সৃষ্টি-কৌশল, দিন-রাতের পরিবর্তন এবং সমুদ্রে সন্তরণকারী নৌযানসমূহের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে নিদর্শন বিদ্যমান।

(সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৪)

কুরআন মজীদে নদনদী ও নৌযান সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। কুরআন মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছে যে, নদনদী ও নৌযানসমূহ আল্লাহ্‌র অন্যতম নিয়ামত। যে জাতি এটা করায়ত্ত করেছে, তারাই দুনিয়ার নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছে।

নিম্নে আমি কুরআনের কয়েকটি আয়াতের তরজমা তুলে ধরছি। এতেই অবগত হওয়া যায়, আল্লাহ্‌ পাক নদনদী ও নৌযানসমূহকে একটা জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করেছেন। কুরআন মজীদে দেখা যায়, হযরত নূহ (আ)-এর কিশ্‌তীই হচ্ছে দুনিয়ার সর্বপ্রথম নৌযান। নৌযান নির্মাণে ইতিহাসের এটাই হচ্ছে সূচনা। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত নূহ (আ) -কে এইমর্মে কিশ্‌তী তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

> আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে একখানা জাহাজ নির্মাণ করতে আরম্ভ করে দাও (সূরা হূদ, রুকূ '৪, আয়াত ৩৭, পারা ১২)। এবং তাঁকে (নূহকে তাঁর স্বজনগণসহ) আরোহণ করালাম তখ্‌তা ও কীলক নির্মিত (জাহাজের) ওপর (সূরা কামার, রুকূ' ১, আয়াত ১৩, পারা ২৭)।
>
> তখন তাদের সকলকে নিয়ে জাহাজটি ভেসে চললো পর্বত পরিমাণ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে (সূরা হূদ, রুকূ' ৪, আয়াত ৪২, পারা ১২)। এবং তাঁর নিদর্শনগুলোর একটি হচ্ছে সমুদ্রে বহমান পর্বত পরিমাণ জাহাজগুলো। ইচ্ছা করলে তিনি বাতাসকে স্থির করে দিতে পারেন। তখন জাহাজগুলো অচল হয়ে দাঁড়াবে পানির ওপর। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শুকরগুযার মানুষের জন্যে (সূরা শূরা, রুকূ' ৪, আয়াত ৩২-৩৩, পারা ২৫)।

আর সাগরে সঞ্চালিত পর্বতের ন্যায় বৃহৎ জাহাজগুলোও তাঁরই অধিকারভুক্ত (সূরা আর-রহমান, রুকূ' ১, আয়াত ২৪, পারা ২৭)।

তিনিই তো আল্লাহ্ যিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্যে সাগরকে বশীভূত করেছেন। যেনো তাতে আল্লাহ্র হুকুমে নৌযানগুলো সঞ্চরিত হতে পারে এবং যেনো তোমরা এর সাহায্যে তাঁর অনুগ্রহদান লাভ করার চেষ্টা পেতে পারো আর যেনো তোমরা তার শুক্রগুযারী করতে থাকো (সূরা জাসিয়া, রুকূ' ২, আয়াত ১২, পারা ২৫)।

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ্ যমীনের সবকিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং নৌযানগুলো তাঁরই হুকুমে সাগরে সন্তরণ করে থাকে (সূরা হজ্জ, রুকূ' ৯, আয়াত ৬৫, পারা ১৭)।

এবং তিনি (আল্লাহ্) নৌযানগুলোকে তোমাদের মঙ্গলের জন্যে বশীভূত করেছেন। যাতে সেগুলো তাঁরই নির্দেশক্রমে নদনদীতে ভেসে বেড়াতে পারে আর ঐ সব নদনদীও তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্যে বশবর্তী করে দিয়েছেন (সূরা ইব্রাহীম, রুকূ' ৫, আয়াত ৩২, পারা ১৩)।

জিজ্ঞাসা করো, স্থলভাগ ও সাগরতলের 'বিপদপুঞ্জ' থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে থাকে? যখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকো গোপনে ও কাকুতি-মিনতি করে? আর বলতে থাকো যে, তিনি যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা নিশ্চয় তাঁর শুক্রগুযার হয়ে থাকবো। বলো, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে এবং অন্যান্য সমস্ত আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। কিন্তু তবু তোমরা তাঁর সাথে শির্ক্ করে থাকো (সূরা আন'আম, রুকূ' ৮, আয়াত ৬৩-৬৪, পারা ৭)।

কে পৃথিবীকে বাসস্থান করেছেন, তার মধ্যে নদনদী প্রবাহিত করেছেন, তার জন্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, সমুদ্রের মধ্যস্থলে অন্তরাল সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ্র সাথে কি অন্য কোনো উপাস্য আছে? বরং এ সম্পর্কে তাদের অধিকাংশেরই কোনো জ্ঞান নেই। অথবা কে বিপদগ্রস্তের প্রার্থনা কবুল করেন; যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তিনি তার বিপদ দূর করে দেন। আর কে তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন? আল্লাহ্র সাথে কি অন্য কোনো উপাস্য আছে? (না, বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে,) তোমরা অতি অল্পই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। অথবা কে স্থল বা সমুদ্রের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে তাঁর অনুগ্রহের

পুরোভাগে সুসংবাদরূপে বায়ু সঞ্চালন করেন? আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো খোদা? তারা যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপন করেছে, তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে (সূরা নামল, রুকূ' ৫, আয়াত ১৬, পারা ২০)।

অথবা গভীর সমুদ্রে অন্ধকাররাশির ন্যায়—যাতে তরঙ্গের ওপরে তরঙ্গ সমাচ্ছন্ন, তদুপরি মেঘমালা বিদ্যমান, পরস্পরের ওপর পরস্পর অন্ধকাররাশি ঘনীভূত; যখন সে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে, তখন সে তা দেখতেও পায় না এবং আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না ফলত তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই (সূরা নূহ, রুকূ' ৫, আয়াত ৪০, পারা ১৮)।

এবং তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদের জন্যে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যেনো এ দ্বারা তোমরা ভূতল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয় আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি (সূরা আন 'আম, রুকূ' ১২, আয়াত ৯৭, পারা ৭)।

এবং এটাও তাঁর (আল্লাহ্‌র) অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি সুসংবাদবাহী সমীরণ প্রেরণ করেন এবং যেনো তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের কিয়দংশ আস্বাদন করান এবং যেনো তাঁর আদেশে নৌযানগুলো পরিচালিত হয় এবং যেনো তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং যেনো তোমরা কৃতজ্ঞ হও (সূরা রূম, রুকূ' ৫, আয়াত ৪৬, পারা ২১)।

এবং তাদের জন্যে এটাও এক নিদর্শন যে, আমি তাদের বংশধরগণকে পরিপূর্ণ তরণীতে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং আমি তাদের জন্যে এরূপ আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে থাকে। এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিতে পারি, অতঃপর তাদের জন্যে কোন উদ্ধারকারী হবে না এবং তারা কেউই পরিত্রাণ পাবে না। কিন্তু আমার নিকট হতেই অনুগ্রহ এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই ভোগ-সম্পদ (সূরা ইয়াসীন, রুকূ' ৩, আয়াত ৪১, পারা ২৩)।

অনন্তর যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা আল্লাহ্‌কে তাঁরই উদ্দেশ্যে বিনত হয়ে অকপটভাবে আহ্বান করে। অনন্তর যখন তিনি তাদেরকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা আল্লাহ্‌র অংশী স্থির করে থাকে (সূরা 'আন্‌কাবূত, রুকূ' ৭, আয়াত ৬৫, পারা ২১)।

তোমরা কি দেখছো না যে, আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহে সমুদ্র মধ্যে নৌযানসমূহ পরিচালিত হয়—যেনো তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন।

নিশ্চয় এর মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এবং যখন পর্বতসদৃশ তরঙ্গমালা তাদেরকে আবৃত করে, তখন তারা আল্লাহ্‌কে তাঁরই উদ্দেশ্যে বিনত হয়ে অকপটভাবে আহবান করে থাকে, অনন্তর যখন তিনি তাদেরকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তখন তাদের কিয়দংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং প্রত্যেক প্রবঞ্চক অবিশ্বাসী ব্যতীত কেউই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না (সূরা লোকমান, রুকূ' ৪, আয়াত ৩১-৩২, পারা ২১)।

দুই

জাহাজ নির্মাণ ও নৌ-চালনার সূচনা

সাগরে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ আল্লাহ্‌র নিদর্শন।
(শূরা)

পুরাকালে মানুষ সমুদ্রকে দুনিয়ার শেষ সীমা মনে করতো। সমুদ্রে পা রাখতে তারা ভীষণভাবে ভয় পেতো। খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সাল পর্যন্ত মানুষ এই ধারণাই পোষণ করতো।

অনুমান, প্রথম দিকে মানুষ বিলে-ঝিলে নৌকা চালাতো। হয়তো প্রথম প্রথম তারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি, ঘাসের আঁটি দ্বারা নদনদী পারাপার করতো। ঘাসের নৌকা আজো নীলনদে দেখতে পাওয়া যায়।

অতঃপর গাছের বড় বড় গুঁড়ি খোখ্‌লা করে কিশ্‌তী তৈয়ার করতে শুরু করে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আজো এ ধরনের নৌকার প্রচলন আছে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গাছের গুঁড়ি খোখ্‌লা করে ক্যাপ্টেন দাস একটি নৌকা তৈরি করেন। তিনি এর দ্বারা বৃটিশ কলাম্বিয়া আমেরিকা থেকে শুরু করে সারা বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। তিন বছরে তাঁর এ ভ্রমণ শেষ হয়।

দজলা (তাইগ্রিস) নদীর জনৈক মাঝি এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ডের ওপর চামড়া বিছিয়ে নৌকা হিসেবে ব্যবহার করেন। তাতে এক সঙ্গে বিশজন লোক আরোহণ করতে পারতো।

দুনিয়ার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম নৌযান নির্মাণ করেন হযরত নূহ (আ)। এটি দৈর্ঘ্যে ২৫০ ফুট, প্রস্থে ৭৫ ফুট, উচ্চতায় ৪৫ ফুট এবং ১৫ হাজার টন ভারী ছিল।

খৃষ্টপূর্ব সপ্ত শতাব্দীতে ফেনেকী জাতিও বহু বড় বড় নৌযান নির্মাণ করেন। এসব নৌযানে তারা কেবল ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী শহরগুলোতেই বাণিজ্য করতেন না, দক্ষিণে আফ্রিকা ও উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতেন।

ফেনেকী জাতির পূর্বে আটলান্টিক জাতিরও জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চালনার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি ছিলো। তাদের নৌঘাটি ছিলো ক্রীট দ্বীপে। এরও আগে কারথেগী নামক এক বিখ্যাত জাতি ছিলো। তারা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাদের জাহাজগুলোতে আটটি করে দাঁড় ছিলো। তারা মালয় উপকূল পর্যন্ত নৌকা বাইচ দিতো। ঘন্টায় ৯ মাইল ছিল সেগুলোর গতিবেগ।

এরপর জাহাজ নির্মাণ শিল্পের মান আরো উন্নত হয়। নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কোনো কোনো অংশে লোহা ব্যবহৃত হয়। এরূপ জাহাজ প্রথম ব্যবহার হয় ইরানী ও পিলে পোনিজের যুদ্ধে। এ সব জাহাজ ছিলো বিশ দাঁড়ী করে। যে সব জাহাজে রাজা-বাদশাহ্ কিংবা নৌবাহিনী প্রধান সওয়ার হতেন, সেগুলোর রশি ও দাঁড় ছিলো রঙীন। এসব জাহাজের পেছন দিকটা ছিলো তাম্র ও রৌপ্য নির্মিত। কোনো কোনোটির দৈর্ঘ্য ছিলো ৯০ ফুট থেকে ৪৫০ ফুট পর্যন্ত। এগুলো ছিলো তেজারতী জাহাজ। যুদ্ধ জাহাজ ছিলো এর চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট।

রোমকরা ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করার পর তাদের যুদ্ধ জাহাজ দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। কেননা, ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ জাহাজগুলো ছিলো অত্যন্ত মযবুত। কারণ, আটলান্টিক মহাসাগর ছিলো ভূমধ্যসাগর অপেক্ষা অধিক তরঙ্গময়। তাই জাহাজগুলোও বেশি শক্ত দরকার হতো।

প্রাচীনকালে নারসীমীন নামক এক জাতি ছিলো। তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের নৌকায় করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতো।

এক সময় ডেনমার্কের অধিবাসীরা যুদ্ধ করে ইংল্যাণ্ড দখল করে নেয়। তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত সম্রাট আলফ্রেড বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করান। ফলে সম্রাট আলফ্রেডের হাতে ডেনমার্কের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তিনি যুদ্ধে ডেনমার্কের ছয়টি জাহাজ অধিকার করেন আর বাকীগুলো ডুবিয়ে দেন। সম্রাট আলফ্রেডই বৃটিশ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রবর্তক।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এক বিরাট জাহাজ নির্মিত হয়। এতে এক সঙ্গে ৪০০ যাত্রী আরোহণ করতে পারতো। ইংল্যাণ্ডের প্রথম জাহাজ শিল্প আইন রচনা করেন সম্রাট রিচার্ড। তাঁর কাছে ২০৩টি বড় ধরনের জাহাজ ছিলো। অতঃপর কিংজন ও তৃতীয় এডওয়ার্ড জাহাজ শিল্প নিজ হাতে নেন। তৃতীয় এডওয়ার্ড যখন কেলে অবরোধ করেন, তখন তাঁর হাতে ৭০০ রণপোত ছিলো।

প্রথম প্রথম যুদ্ধ জাহাজে মিন্‌জানীক স্থাপন করা হতো। অতঃপর নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে তোপ লাগানো শুরু হয়। যুদ্ধ জাহাজে সর্বপ্রথম তোপ ব্যবহার করেন ইংল্যাণ্ডের সপ্তম হেনরী। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড দু'টি জাহাজ ছিলো। কলম্বাস এ জাহাজ দু'টিতে করেই আমেরিকা আবিষ্কারে বের হয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে ইউরোপে জাহাজ শিল্পের উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। এ সময় জাহাজ চালনার বাষ্পও আবিষ্কৃত হয়। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে ইউরোপের অনেক দেশেই লাখ টনী ওজনের জাহাজ ছিলো। বৃটেন ছিল এদের সবার

অগ্রণী। আর এখন তো নিছক ইংল্যাণ্ডের হাতেই ১৫ কোটি টন ওজনের বহু জাহাজ বিদ্যমান।

দু'শ' বছরে ইংল্যাণ্ড জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে। প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ড ছিল একটি দুর্বল ও দরিদ্র দেশ। অতঃপর তার বীর যুবশক্তি রাত-দিন পরিশ্রম করে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় আজ থেকে বহু বছর আগেই দুনিয়ার এক জবরদস্ত নৌশক্তির অধিকারী ছিলো। কলম্বাসকে আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলিম নাবিকরাই পথ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি! বলতে গেলে কিছুই নয়! আজ মুসলিম জাতির নিকট যুদ্ধ জাহাজও নেই। বাণিজ্য জাহাজও নেই। সমুদ্রের নাম শুনলেই তারা ভয়ে কম্পমান। অথচ কুরআন মজীদ স্পষ্ট ঘোষণা করছে যে, "সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন।"

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নেথন হিল্‌স্ সর্বপ্রথম বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এতে পুরাপুরি সফল হতে পারেন নি। তাঁর নির্মিত জাহাজে কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ফিল্টন নামক জনৈক আমেরিকান আবিষ্কারক একটি বাষ্পীয় তরণী নির্মাণ করেন। এটি বায়ুর বিপরীত দিকে ঘন্টায় সাড়ে চার মাইল বেগে ছুটে চলতো। এই আবিষ্কারকই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পাঁচ শ' টন ওজনের এক বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করেন। এটি নির্মাণ করতে ২২ হাজার পাউণ্ড খরচ হয়েছিলো।

এরপর বাষ্পীয় জাহাজ সর্বত্র দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের নৌবন্দরসমূহে যেসব বাণিজ্য জাহাজ ভিড়তো, তন্মধ্যে তেরো হাজারই ছিলো বাষ্প পরিচালিত। একটি মাত্র শতাব্দীর সাধ্য-সাধনাই ইউরোপ-আমেরিকাকে সাফল্যের এই দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়।

এ সময় ইউরোপের জাহাজ নির্মাতারা এ শিল্পকে আরো সামনে অগ্রসর করতে তৎপর হয়। নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের জাহাজ নির্মাতারা চার হাজার টনী এক দ্রুতগামী জাহাজ নির্মাণ করে। এ জাহাজটি মাত্র চার দিন ১৭ ঘন্টায় দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মহাসাগর আটলান্টিক পাড়ি দেয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স এক ভয়ঙ্কর জাহাজ নির্মাণ করে। এটির ওজন ছিল ৬৮ হাজার টন। ওই বছরই ইংরেজরা ৭৩ টনী এক জাহাজ নির্মাণ করে। এটির ইঞ্জিনশক্তি ছিল ৮০ হাজার অশ্বশক্তিবিশিষ্ট। একই সময় ইংরেজরা অলিম্পিক নামে এক নতুন জাহাজ তৈয়ার করে। যার দৈর্ঘ্য ছিলো ৮৫২ ফুট, প্রস্থ ৯২ ফুট এবং গভীরতা ১৭৫

ফুট। ইঞ্জিনের শক্তি ৯০ হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন। এতে ৮৬০ জন মাঝি-মাল্লা কর্মরত ছিলো।

বস্তুত এরূপ শক্তিমত্তাই হচ্ছে একটি জীবন্ত জাতির উজ্জ্বল প্রতীক। এরূপ বীর্যবত্তাই একটি উদীয়মান জাতিসত্তার প্রকৃষ্ট সোপান। এরূপ প্রতিপত্তি বলেই একটি জাতি বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

সত্যই 'নৌযান আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব নিদর্শন-যা সমুদ্রবক্ষে পর্বতের ন্যায় সন্তরণ করে বেড়ায়।'

সত্যই একটি জীবন্ত জাতি দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস করে, যা বিশ্ববাসীকে পদে পদে উপলব্ধি করতে হয়। একটি জীবন্ত জাতি তার শত্রু পক্ষের জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। সীসাঢালা প্রাচীরসদৃশ। একটি জীবন্ত জাতির শক্তি হবে দুরন্ত-দুর্বার। কার্যক্ষমতা হবে অপরিমেয়। সামরিক ছাউনি হবে সেনা-সৈন্য পরিপূর্ণ। নৌঘাটি থাকবে ভয়ঙ্কর রণপোতে সজ্জিত এবং আকাশ-পথ হবে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমানে মুখরিত।

কুরআন মজীদ মুসলমানদের বরাবর স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, 'তোমরা দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস করবে যে, মানুষ তোমাদের অস্তিত্ব হরদম অনুভব করবে।' 'তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানদের জন্যে কঠোর হও।' 'আমি তোমাদেরকে ইস্পাত দান করেছি, যা এক প্রকার ভয়ঙ্কর ধাতু বিশেষ। তোমরা তার দ্বারা শক্তিমান হও।' 'নৌযান আল্লাহ্‌র নিদর্শন।' তোমরা এমন শক্তি সঞ্চয় করো এবং তোমাদের আস্তাবলসমূহ এমনসব রণমত্ত অশ্বে সজ্জিত করো–যা দেখে তোমাদের প্রতিপক্ষসমূহের পিলে চমকে যায়।'

তিন

নৌ-চালনায় মুসলমানদের অবদান

নৌযান জাতীয় উৎকর্ষের মস্তবড় হাতিয়ার। তাই জাতীয় নেতাদের কর্তব্য হচ্ছে জাতিকে নৌ-শিল্পে উদ্বুদ্ধ করা।

—জনৈক চিন্তাবিদ

আরবের অধিবাসীরা ইসলাম-পূর্ব যুগে সমুদ্র পর্যটনে অভ্যস্ত ছিলো না। অবশ্য য়ামনের হিমিয়ার ও সাবা গোত্রের নিকট কিছু মা'মুলী ধরনের নৌযান ছিলো। তারা এগুলো দ্বারা কোনোমতে আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের কাজ চালাতো।

হিজাজের অধিবাসীরা সবসময় সমুদ্রযাত্রা এড়িয়ে চলতো। তারা নৌপথে কদম রাখতে ভীষণ ভয় পেতো। অন্য কথায় বলতে গেলে তারা ছিলো নৌ-পর্যটনে সর্বতোই নিঃস্পৃহ।

ইসলাম-পরবর্তী যুগে মিসর ও সিরিয়ার উপকূলে যখন ইসলামী পতাকা উড্ডীন হলো এবং মুসলমানরা রোমকদের যুদ্ধ জাহাজ ও সমুদ্র যুদ্ধ অবলোকন করলো, তখন তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার স্বার্থে শত্রুর মুকাবিলার জন্য নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করলো। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন মুসলিম সিপাহসালার আলা ইব্‌ন আল্‌হাযরমী। ইনি ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বাহরায়নের শাসনকর্তা।

আলা ইব্‌নে আল্‌হাযরমীর ইরাদা ছিল ইরানের উপকূলবর্তী এলাকাগুলোকে ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু তাঁর এই সংকল্পের পথে একমাত্র অন্তরায় ছিলো পারস্য উপসাগর। বাহরায়ন থেকে ইরান উপকূলে সৈন্য পরিচালনা করতে হলে পারস্য উপসাগরের নৌপথ ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। তাই তিনি পানিপথেই সৈন্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত করেন।

সিদ্ধান্ত অনুসারে নৌযানেই তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে। কারণ আলা ইব্‌ন আল্‌হাযরমী খলীফা হযরত উমর (রা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকেই সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। মুসলিম বাহিনীর এই পরাজয়ের ঘটনায় এক বিরাট শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তা হলো, নেতার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়।

খলীফা উমরের নিকট যখন এই স্বেচ্ছাচারিতার খবর পৌছলো তখন তিনি অতিশয় রাগান্বিত হন এবং আলা ইব্‌ন আল্‌হাযরমীকে সেখান থেকে হটিয়ে কূফার শাসনকর্তা হযরত সা'আদ ইব্‌ন আবী আক্কাস (রা)-এর অধীনস্থ করে দেন, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কেউ এরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ না করে।

উক্ত সামুদ্রিক আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর খলীফা হযরত উমর (রা) মুসলিম সিপাহ্সালারদের প্রতি এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেননা, তখন তিনি স্থল বাহিনী সংগঠনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর মতে, নৌবাহিনী গড়ে তোলার উপযুক্ত সময় তখনো হয়নি। এজন্যে তিনি সেদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেন নি।

আমীর মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ান সিরিয়া ও পশ্চিম জর্দান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী দক্ষ বীর সেনানী। রোমক বাহিনীর সাথে তাঁর প্রায়ই মুকাবিলা করতে হতো। এজন্যে নৌবাহিনী গড়ে তোলার গুরুত্ব তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। তাঁর মতে, একটি সুসংগঠিত নৌবাহিনী ছাড়া রোমকদের সার্থক মুকাবিলা ছিলো দুরূহ ব্যাপার। তাই তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর দরবারে একটি নৌবাহিনী সংগঠনের আবেদন পেশ করেন। আবেদনে তিনি নৌবাহিনী গঠনের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দান করেন। খলীফা উমর (রা) মিসরের গভর্নর আমর ইব্নুল আসের নিকট সমুদ্র-ভ্রমণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য চেয়ে এক পত্র লিখেন। হযরত আমর ইব্নুল আস এই মর্মে পত্রের উত্তর লিখেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন! সমুদ্র যেনো আল্লাহ্র এক মস্তবড় সৃষ্টি। তার ওপর আল্লাহ্র এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষ আরোহণ করে। সমুদ্রে বসে আকাশ এবং পানি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে পিলে চমকে ওঠে। আর সমুদ্র যদি উর্মিমুখর হয়, তাহলে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি সন্দেহ হ্রাস পায় এবং একীন বেড়ে যায়। মানুষের সমুদ্র-যাত্রার অবস্থা এরূপঃ "একটি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ওপর যেনো একটি পতঙ্গ উড়ে পড়লো। কাষ্ঠখণ্ডটি যদি উল্টে যায়, তা হলে পতঙ্গটি ডুবে যাবে আর কাষ্টখণ্ডটি সঠিকভাবে কিনারে পৌঁছলে পতঙ্গটি সোল্লাসে উড়ে যাবে।"

আমর ইব্নুল আসের এই উত্তর আসার পর খলীফা উমর (রা) এই মর্মে আমীর মু'আবিয়ার পত্রের উত্তর দেনঃ "আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি— —যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন—আমি সমুদ্র অভিযানে একজন মুসলমানকেও প্রেরণ করবো না।" এরপরও আমীর মু'আবিয়া রোমান নৌবাহিনীর মুকাবিলার কথা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন।

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে আমীর মু'আবিয়া পুনরায় মুসলিম নৌবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন এবং বিষয়টি ভেবে দেখার জন্যে খলীফার নিকট বার বার অনুরোধ জানান। খলীফা উসমান (রা) এই শর্তে আমীর মু'আবিয়ার দরখাস্ত মঞ্জুর

করেন যে, সামুদ্রিক যুদ্ধে যারা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে চাইবে, তিনি কেবল তাদেরই নিতে পারবেন। যারা স্বেচ্ছায় রাযী না হবে, তাদের তিনি বাধ্য করতে পারবেন না।

মোটকথা, ২৮ হিজরীতে মুসলিম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন হয়। আমীর মু'আবিয়া ছিলেন এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যারপরনাই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মুসলিম নৌবাহিনী গড়ে তোলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে সর্বপ্রথম সাইপ্রাস দ্বীপে নৌ-আক্রমণ চালান। সাইপ্রাসবাসীরা আমীর মু'আবিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। আমীর মু'আবিয়া ৭২০০ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সাইপ্রাসবাসীদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

মুসলিম নৌবাহিনীর প্রথম হামলা সফল হওয়ার পর তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়। এবার তারা মুসলিম নৌবাহিনীকে আরো মযবুত করে পুনর্গঠন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের নৌশক্তি রোমানদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁরা বিভিন্ন মওসুমে বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চল আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।

আরবদের নৌ-পর্যটন ও সমুদ্র-অভিযানের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তাঁরা প্রথম দিকে এ বিষয়টি রোমানদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। রোমান নৌ-বন্দীদের তাঁরা এই কাজে নিয়োগ করতেন। নৌযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে অসংখ্য রোমান জাহাজ-মিস্ত্রী ও কাপ্তান বন্দী হয়েছিলো।

এরা মুসলমানদের জন্য জাহাজ নির্মাণ করতো, নৌসেনা তৈরি করতো এবং রণপোতগুলোকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করে তার ওপর মুসলিম ফৌজী নও-জওয়ানদের আরোহণ শিক্ষা দিতো।

রণপোত সমষ্টিকে (নৌবহর) মুসলমানরা 'উস্তূল' বলতেন। তাঁদের এইসব উস্তূলের ঘাঁটি (নৌঘাঁটি) ছিলো ভূমধ্যসাগর। মুসলিম নৌবাহিনীতে সিরিয়া, আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানগণ সবিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। এইসব দেশের মুসলমানগণ বিরাট বিরাট জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। এইসব কারখানাকে তাঁরা 'তার্সানা' (দারুস্ সানাআ'র বহুল ব্যবহৃত রূপ) নামে অভিহিত করতেন।

এইসব 'তার্সানা'য় জাহাজ নির্মাণের আসবাবপত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি হতো। সমকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'তারসানা' নির্মিত হয়েছিলো বনু উমাইয়ার প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের শাসনকালে তিউনিসে।

এই 'তার্সানা'টি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিলো ভূমধ্যসাগর ও তার ছোট বড় দ্বীপগুলোকে মুসলিম শাসনাধীন রাখা। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নির্দেশে

আফ্রিকার গভর্নর হাস্‌সান ইব্‌ন নু'মান তিউনিসের পোতাশ্রয়ে নৌযুদ্ধের সামান তৈরি ও মহড়া অনুষ্ঠিত করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তিউনিস মুসলমানদের এক উৎকৃষ্টতম নৌকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই নৌবহর মুসলিম উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের নিরাপত্তা বিধান করতো।

ভূমধ্যসাগরের এক বিরাট দ্বীপ। দ্বীপটির নাম 'সাকালিয়া'। মুসলমানরা এটিকে দখল করতে চাইলেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের শাসনকালে এটি দখল করার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বনু গালিব খানদানের শাসন আমলে এই দ্বীপটি বিজিত হয়। এই বংশের বিখ্যাত সম্রাট যিয়াদাতুল্লাহ্ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আগ্‌লাবের নৌশক্তির কথা মুসলিম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই কীর্তিমান পুরুষের শাসন আমলেই 'সাকালিয়া' মুসলমানদের পদানত হয়।

এই ঘটনার পর মুসলমানগণ অচিরেই তাঁদের নৌশক্তি দ্বারা ভূমধ্যসাগরের সমস্ত উপকূলবর্তী এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলসমূহ করায়ত্ত করতে সক্ষম হন। তাঁদের মুকাবিলা করার আর কোনো শক্তিই অবশিষ্ট ছিলো না। তখন মুসলিম নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন আসাদ ইব্‌ন ফুরাত। তিনি ভূমধ্যসাগরে রোমান নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করেন। এরপর থেকে মুসলমানদের মধ্যে নৌযুদ্ধের উৎসাহ আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁরা আফ্রিকা, স্পেন ও সিরিয়ায় অসংখ্য তার্‌সানা (জাহাজ নির্মাণ কারখানা) প্রতিষ্ঠা করেন।

আব্দুর রহমান আন্‌নাসিরের আমলে একমাত্র স্পেনেই দুইশ'টি বিরাটকায় রণপোত বিদ্যমান ছিলো। এগুলো অহর্নিশ স্পেনের উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করতো। আফ্রিকায়ও এক বিশাল নৌবহর গড়ে উঠেছিলো। এ হচ্ছে হিজরী চার শতকের কথা।

স্পেনে বেশ ক'টি 'তার্‌সানা' গড়ে উঠেছিলো। প্রতিটি 'তার্‌সানার' নিজস্ব উস্তূল (নৌবহর) ছিলো। প্রতিটি উস্তূলের আবার একেকজন নৌ-প্রধান ও সর্দার ছিলেন। নৌ-প্রধানগণ নৌবহরের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌসেনাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। আর সর্দারগণ রণপোতে পালতোলা ও তার পরিচালনার উপকরণাদির যোগান দিতেন। রণপোতে মাঝি-মাল্লাও সর্দারগণই সরবরাহ করতেন।

নৌবহরের পরিচালন ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুশৃংখল ছিলো। কোনো নৌবহর যখন কোনো বিশেষ স্থান আক্রমণের প্রস্তুতি নিতো কিংবা সমুদ্র অভিযানের মহড়া প্রদর্শনের সংকল্প করতো, তখন তা এক বিশেষ নৌবন্দরে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতো। গোটা নৌবহরটি পরিচালনা করতেন একজন সুদক্ষ নৌ-প্রধান।

মিসরে হিজরী প্রথম শতকে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ কারখানার পত্তন হয়। এখানে সর্বপ্রথম উস্তূল (নৌবহর) প্রতিষ্ঠা করেন মিসরের শাসনকর্তা গিব্‌তা ইব্‌ন ইসহাক। ইনি মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ আব্বাসীর আমলে মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তখন রোমান বাহিনী 'দামিয়াত' অধিকার করে সেখানে ব্যাপক লুটতরাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা চালাচ্ছিলো। এতে মিসর অধিপতি গিব্‌তা ইব্‌ন ইসহাক যারপরনাই মর্মাহত হন এবং রোমানদের সমুচিত শাস্তিদান মানসে একটি নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন। আর এভাবেই মিসরে একটি নৌবাহিনী সংগঠিত হয়।

মিসর অধিপতি নৌসেনার জন্যে বিভিন্ন পুরস্কার ও দৈনিক মজুরি বরাদ্দ করেন। ফলে সবাই তাদের জওয়ান ছেলেদের নৌবাহিনীতে ভর্তি করা শুরু করেন। তিনি এইসব নও-জওয়ানকে ফৌজী তা'লীমদানের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কমাণ্ডার নিয়োগ করেন।

নৌসেনাদের উপযুক্ত ট্রেনিং দানের পর তিনি 'দামিয়াত' আক্রমণ করেন। তীব্র সংঘর্ষের পর রোমান বাহিনী পর্যুদস্ত ও 'দামিয়াত' পুনর্দখল হয়।

আব্বাসিয়াদের পর মিসরে ফাতিমী যুগের সূচনা হয়। তারা অচিরেই 'দামিয়াত' ও আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌবহর গড়ে তোলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মিসরে ফাতিমী যুগেই নৌশক্তির উৎকর্ষ সূচিত হয়। তাঁরা নৌসেনাদের বেতন ছাড়া জায়গীরও প্রদান করতেন। এসব জায়গীরকে তাঁরা 'গাযীদের আব্‌ওয়াব' নামে অভিহিত করতেন। যুদ্ধের সময় নৌ-প্রধান গোটা নৌবহরের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করতেন।

বেতন ও ওযীফা বাদশাহ্ খোদ নিজ হাতে বন্টন করতেন। এতে দেশের অন্যান্য বাহিনী অপেক্ষা নৌবাহিনীর সম্মান বৃদ্ধি পেতো। মু'ইয্‌যু লিদীনিল্লাহ্‌র শাসনামলে যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ৬০০-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

নৌবহরের যুদ্ধ যাত্রাকালে মহা ধুমধামে জলসা অনুষ্ঠিত হতো। সাড়ম্বরে আনন্দ-উৎসব চলতো। জলসায় স্বয়ং বাদশাহ্ তাঁর পারিষদসহ উপস্থিত থাকতেন। বাদশাহ্ ও তাঁর পারিষদবর্গ নীলনদের তীরবর্তী 'মাকাস' নামক স্থানে এক বিশেষ ছাউনিতে বসে এই দৃশ্য উপভোগ করতেন। জাহাজীরা এই ছাউনির নীচে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে আসতো। জাহাজগুলো যুদ্ধাস্ত্র ও আসবাবপত্রে সুসজ্জিত হয়ে জাতীয় পতাকা ধারণ করতো। তারপর যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রদর্শন করে বেরিয়ে যেতো।

যুদ্ধে যেসব রণ-নৈপুণ্যের প্রয়োজন পড়তো, তার সবগুলোই তখন দেখাতে হতো। অতঃপর প্রতিটি জাহাজের নৌ-প্রধান ও সর্দারগণ বাদশাহ্‌র সামনে হাযির হতেন। বাদশাহ্ তাঁদের পুরস্কৃত করতেন।

যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালেও এরূপ জমকালো উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। নৌযুদ্ধ বিভাগের এক আলাদা দফতরও খোলা হয়েছিলো। এই দফতরের নাম ছিলো 'দিওয়ানুল উস্তুল'। নৌবাহিনীর সমস্ত খরচপত্র এই দিওয়ানই নির্বাহ করতো।

মুসলিম শাসন বিস্তারে মুসলিম নৌবাহিনীর ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। মুসলিম শাসকগণ নৌবাহিনীর সাহায্যেই ভূমধ্যসাগরের বড় বড় দ্বীপাঞ্চল– সার্ডিনিয়া, সিসিলী, মাল্‌টা, ক্রীট ও সাইপ্রাস প্রভৃতি অধিকার করেন। এইসব দ্বীপাঞ্চল ব্যতীত মুসলমানগণ বহু উপকূলীয় এলাকাও করায়ত্ত করেন। বহু ইউরোপীয় অঞ্চলও মুসলিম অধিকারে আসে।

মুসলিম নৌবহরসমূহ গোটা ভূমধ্যসাগরে চক্কর দিয়ে বেড়াতো। ইউরোপের উপকূলবর্তী দেশসমূহে যখন-তখন হামলা করতো।

ভূমধ্যসাগর উপকূলের ইউরোপীয় দেশসমূহে সবচেয়ে বড় আক্রমণ হয় সিসিলীর সম্রাট বানুল্ হাসানের শাসনকালে। তাঁর প্রচণ্ড নৌ-আক্রমণে ইউরোপে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিলো।

মোট কথা, মুসলমানগণ নৌবহরের সাহায্যে গোটা ভূমধ্যসাগরের একচ্ছত্র মালিক বনে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্থলভাগের ন্যায় পানিভাগেরও সর্বাধিনায়ক বনেছিলেন। এ হচ্ছে তখনকার কথা, যখন গোটা ইউরোপবাসী অধঃপতন ও অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। তাদের নৌশক্তি ছিলো মুসলমানদের তুলনায় নির্জীব ও হীনবল।

আজ মুসলমানদের নৌশক্তি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। আর ইউরোপের অধিবাসীরা গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তারা বহু মুসলিম রাজ্য ও উপকূলীয় অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা করে রাজত্ব ও নৌবহর উভয়ই দখল করে নিয়েছে।

স্পেন থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়েছে। স্পেনের মুসলিম নৌশক্তি ইউরোপীয়দের হস্তগত হয়েছে। সিসিলীর মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানকার মুসলিম নৌশক্তিও চিরতরে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

একদিন যে নৌসেনাদের 'মুজাহিদীন ফী সাবীলিল্লাহ্' এবং 'গুযাত্ ফী আ'দাইল্লাহ্'র গৌরবদীপ্ত উপাধিতে ভূষিত করা হতো, আজ অধঃপতন ও লাঞ্ছনার

যুগে সেই 'উস্তুল'-কে একটি বাজারী শব্দ ভাবা হচ্ছে। আর যুদ্ধ-জাহাজের ক্রিয়াকাণ্ডকে গণ্য করা হচ্ছে অপমান ও লজ্জার বিষয় হিসেবে।

বস্তুত যেদিন থেকে মুসলমানরা তাদের নৌশক্তি হারিয়ে ফেললো, সেদিন থেকেই তারা দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হলো। রাজ্য গেলো। রাজত্ব গেলো। স্থলভাগেরও আধিপত্য গেলো। মৃত্যুভয় প্রবলতর হলো। সমুদ্রাতঙ্ক বৃদ্ধি পেলো। শৌর্যবীর্য বিলুপ্ত হলো। পরিণাম ফল ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। আমাদের এখন তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

মুসলিম রণপোত কারখানা

মুসলিম শাসন বিস্তারে নৌবহরের ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। মুসলমানরা ভূমধ্যসাগরে রণপোত নির্মাণের বিরাট বিরাট কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। এগুলোকে তাঁরা 'তারসানা' নামে অভিহিত করতেন। 'তারসানা' মূলত 'দারুস্‌সানা'আ' (কারখানা) ছিলো। বহু ব্যবহারে 'তারসানা' বা 'তার্‌স্‌খানা' রূপ ধারণ করেছে।

আরবরা জাহাজ নির্মাণ কারখানাকে 'দারুস্সানা'আ' বলতো। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে তারা পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলো। আরবদের বদৌলতে আজ বিশ্ববাসী নৌশিল্পে এত উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক রণপোত শিল্প আরবরাই পত্তন করেছিলো। ইউরোপের অধিবাসীরা স্পেন, সিসিলী এবং আফ্রিকায় আরবদের নিকট থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করেছিলো। আরবদের পূর্বে জাহাজ-নির্মাতা ও জাহাজ চালক ছিলো রোমকরা। কিন্তু তাদের জাহাজ-নির্মাণ ও নৌ-চালনা ছিলো সম্পূর্ণ পুরানো ধাঁচের। রোমকরা নিছক ছোট ছোট রণতরীই নির্মাণ করতে পারতো। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ তাদের কারখানায় তৈরি হতো না। আরবরাই এই শিল্পে নতুনত্ব আনয়ন করেন। নতুন নতুন মডেল ও কৌশল আবিষ্কার করেন। আরবরাই সর্বপ্রথম নৌ-দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দফতরের নাম ছিলো 'দীওয়ানুল উস্তুল'। এই দফতরের অধীনে অনেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁরা রণতরীর নতুন নতুন মডেল ও নক্শা তৈরি করতেন।

পূর্বেই উল্লেখ্ করা হয়েছে যে, স্পেন, আফ্রিকা, মিসর ও সিরিয়া ছিলো মুসলমানদের বড় বড় নৌকেন্দ্র। এই সবগুলো দেশই ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ সব সময়ই তার মনোরম আবহাওয়ার দরুন তাহ্যীব-তামাদ্দুনের কেন্দ্রভূমি ছিলো।

মুসলমানরা তাঁদের সর্বপ্রথম 'দারুস্সানা'আ' প্রতিষ্ঠা করেন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মিসরের 'ফুসতাত্' নামক স্থানে। আহ্মদ ইব্ন তূলূন এই কারখানার উন্নতি বিধানে প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। আখ্শেদী খান্দানের শাসকরাও এর সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন।

ফাতিমী শাসকগণ এটি 'ফুস্তাত্' থেকে 'মাকাসে' স্থানান্তর করে আরো শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি দান করেন। নদনদী ও সাগর-মহাসাগরেই ছিলো তাঁদের প্রকৃত রাজস্ব। তাঁদের রণতরী যেমন দেশের প্রতিরক্ষা কাজে নিরত থাকতো, তেমনি তাঁদের বাণিজ্যতরীগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের পণ্যসম্ভার বহন করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পৌঁছে দিতো।

ফাতিমী আমলে দুই ধরনের জাহাজ নির্মিত হতো। এক—যুদ্ধ জাহাজ। এগুলোকে 'উস্‌তূল' বলা হতো। শুধু যুদ্ধের কাজেই ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন রণসম্ভার ও নৌসেনারা অবস্থান করতো। দুই—তেজারতী জাহাজ। এগুলো দ্বারা শুধু একদেশ থেকে আরেক দেশে পণ্যসামগ্রী আনা-নেয়া হতো। এগুলোকে বলা হতো 'নীলী' জাহাজ। 'নীলী' জাহাজগুলো 'উস্‌তূল' থেকে আকারে ছোট হতো। ছোট নদ-নদীতেও যাতায়াত করতে পারতো।

'দারুস্‌সানা'আ'য় ছোট-বড় অনেক রকম যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হতো। নামও ছিলো বিভিন্ন। আকার-আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতিও ছিলো নানারূপ। এগুলোর সমষ্টিকে 'উস্‌তূল' বলা হতো। আমরা এখানে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজের নাম উল্লেখ করছি।

শূনা ঃ এগুলো বিরাটকায় ছিলো। এতে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কিল্লা ও মিনার তৈরি হতো।

হাররাকা ঃ এগুলোতে 'মিন্‌জানীক' স্থাপন করা হতো। 'মিন্‌জানীক' দ্বারা শত্রুপক্ষের ওপর বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করা হতো।

তার্‌রাদা ঃ এ ছিলো এক ধরনের ছোট দ্রুতগামী নৌবিশেষ।

উশারিয়াত (এক বচনে 'উশারী') ঃ এতে করে নৌ-সেনারা নীলনদে টহল দিয়ে বেড়াতো।

শালান্‌দিয়াত্‌ (এক বচনে 'শালান্‌দী') ঃ এসব দিয়ে বিভিন্ন খবরাখবর পৌছানো হতো।

মিস্‌তাহাত্‌ (এক বচনে 'মিস্‌তাহ্‌') ঃ 'মিস্‌তাহ্‌' সাধারণ যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতো।

আরবী জাহাজের আকার-আকৃতি গ্রীক ও রোমান জঙ্গী জাহাজের অনুরূপ ছিলো। কারণ, আরবরা এই বিদ্যাটি গ্রীক ও রোমকদের নিকট থেকেই শিখেছিলেন।

আরবদের জঙ্গী জাহাজে সাধারণত এইসব রণসম্ভার মওজুদ থাকতোঃ যিরাহ্‌ (লৌহবর্ম), খোদ (শিরস্ত্রাণ), ঢাল, নেযা, কামান, লৌহ যিঞ্জীর ও মিন্‌জানীক। মিন্‌জানীক দ্বারা শত্রু জাহাজের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হতো।

যুদ্ধ-জাহাজের থামের ওপর বড় বড় সিন্দুক বাঁধা থাকতো। তাতে নৌসেনারা ওঁত পেতে বসে থেকে শত্রুপক্ষের ওপর পাথর, বিস্ফোরক, গরম চুন ইত্যাদি নিক্ষেপ করতো।

আরব রণপোতগুলোতে নব-উদ্ভাবিত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হতো। যখন যে যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কৃত হতো, তাই দিয়ে তা সজ্জিত করা হতো।

জাহাজের চারদিকে চামড়া, পশমী কাপড় প্রভৃতি মুড়ে দেয়া হতো। আবার কখনো কখনো জাহাজের কাঠে এমন এমন জিনিস সেঁটে দেয়া হতো, যাতে সেগুলোতে আগুন ধরে যেতে না পারে। যুদ্ধের সময় শত্রুর নজর থেকে বাঁচার জন্যে জাহাজে নিষ্প্রদীপ মহড়ার ব্যবস্থা করা হতো। হাঁস-মুরগী ও পাখ-পাখালি রাখা হতো না। অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জাহাজের ওপর নীল রঙের কাপড় চড়িয়ে দেয়া হতো, যাতে শত্রুপক্ষ দূর থেকে জাহাজ দেখতে না পায়।

মুসলমানরা তাঁদের রণতরীর চারপাশে লোহার নেযা ও লম্বা সুচালো লৌহখণ্ড লাগিয়ে দিতো। ফলে, শত্রু জাহাজ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারতো না। ঘেঁষা মাত্র ফুটো হয়ে পানিতে ডুবে যেতো।

মুসলমানরা জাহাজ নির্মাণের নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেন। এসব কৌশল গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো না। ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের নিকট থেকে এগুলো লুফে নেয়। পরে তারা এর আরো উন্নতি সাধন করে।

ইউরোপে বাষ্প আবিষ্কৃত হওয়ার পর নৌ-জাহাজেও তার ব্যবহার শুরু হয়। এখন এই শিল্পটি জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। যে জাতির নিকট উন্নত নৌশক্তি নেই, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। দেশের নিরাপত্তা ও বাণিজ্য দুই-ই বিপন্ন।

পাঁচ

মুসলিম নৌবন্দরসমূহ

যে দেশ ও জাতির উন্নত নৌবন্দর নেই, তারা শক্তিমান হতে পারে না। বাণিজ্যিক উন্নতি ও দেশরক্ষার জন্যে নৌবন্দর, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চালনা শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

— জনৈক ঐতিহাসিক

ইসলাম আরবদের মধ্যে এক নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ফলে আরবদের বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। ইসলাম আরবদের একটি নতুন দীন দিয়েছে। একটি নতুন তামাদ্দুন দিয়েছে। নতুন উদ্যম ও নতুন আবেগ দিয়েছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির শিরা-উপশিরায় নতুন শোণিত প্রবাহিত করেছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও খিলাফতে রাশিদার যুগে তার পরিধি ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর খিলাফতকালে মুসলমানরা একদিকে পারস্য উপসাগর ও অপরদিকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অতিক্রম করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁদের তখন সমসাময়িক বিশ্বের দুই বৃহৎ নৌশক্তি-ইরান ও রোমের মুকাবিলা করতে হয়েছিলো। ইরানীদের নৌকেন্দ্র ছিলো পারস্যোপসাগরের উবাল্লা বন্দর। আর ভূমধ্যসাগরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছিলো রোমকদের নৌকেন্দ্র।

উবাল্লা ছিলো ইরানীদের সর্ববৃহৎ নৌবন্দর। এখান থেকেই ইরানীদের বাণিজ্যতরীগুলো হিন্দুস্তান ও চীন দেশে যাতায়াত করতো। তেমনিভাবে রোমানদের বাণিজ্যতরীগুলোও আলেকজান্দ্রিয়া নৌ-বন্দর থেকে কনস্টান্টিনোপল ও পশ্চিম আফ্রিকার বন্দরগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।

দুটি নৌকেন্দ্রই আরবদের দখলে আসে। তখন তারা আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য হযরত উমর (রা)-এর নিকট দরখাস্ত করেন। অভাবিত বিজয়োদ্দীপনা তাদের আরো সামনে বাড়ার জন্য ব্যাকুল করে তুলেছিলো। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাদের অনুমতি দিলেন না।

হযরত উমর (রা) যে সমুদ্রের ভয়াল মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তা নয়। বরং তাঁর অনুমতি না দেয়ার কারণ ছিলো, আরবদের সমুদ্র অভিযানে পূর্ব-অনভিজ্ঞতা। ইরান ও রোমের অধিবাসীরা ছিলো নৌবিদ্যায় পারদর্শী। হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে আগেই বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিপথে ছিলো আলা ইব্ন হায্রমীর একটি সদ্য পরাজয়ের ঘটনা। আলা ইব্ন হায্রমী যে মাত্র কিছুদিন আগেই শত্রুপক্ষের

কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এখানেও তা তুলে ধরা হলো।

আলা ইব্‌ন হায্‌রমী ছিলেন বাহ্‌রায়নের গভর্নর। তিনি বাহ্‌রায়নে কতকগুলো রণতরী যোগাড় করে নদীপথে ইরানের বিখ্যাত পারস্য অঞ্চলে হামলা করেন। কিন্তু ইরানীরা নদীর তীর ধরে সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ফলে মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং স্থলপথে ফৌজী সাহায্য এসে পৌঁছলে পর তাঁরা এই অবরোধ থেকে মুক্তি পান।

হযরত উমর (রা) শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক নৌ-চালনার বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনিই নৌ-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কি করে? এখন তাই শোনো!

একবার আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন ছিলো হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল। অষ্টাদশ হিজরী সাল। হযরত উমর (রা) আরবদের জন্য মিসর থেকে খাদ্য আমদানী শুরু করেন। কিন্তু স্থলপথে খাদ্য পৌঁছতে অনেক বিলম্ব ঘটছিলো। তাই তিনি এই সমস্যা সমাধানকল্পে এক সহজ পন্থা উদ্ভাবন করেন। তিনি উনসত্তর মাইল দীর্ঘ এক নহর খনন করে নীলনদকে লোহিত সাগরের সাথে মিলিয়ে দেন। এই খননকার্য ছয় মাসে সম্পন্ন হয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এই নহর দিয়ে নৌকাযোগে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য মিসর থেকে আরবের 'জার' বন্দরে পৌঁছে যায়। এরপর বহুদিন পর্যন্ত এই খাল আরবদের অনেক উপকারে আসে।

আমর ইব্‌ন আস (রা) মিসরের গভর্নর ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সুয়েজ খাল কেটে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে মিলিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাঁর এই প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, "এর ফলে রোমকরা মুসলিম হজ্জযাত্রীবাহী জাহাজ ছিনতাই করার সুযোগ পাবে।"

এখন আমরা মুসলিম অধিকৃত নৌবন্দরগুলোর একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

জার ঃ এ নৌবন্দরটি লোহিত সাগরের আরব উপকূলে বর্তমান 'য়াম্‌বু' বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিলো। সপ্তম হিজরীতে যে মুসলিম দলটি হাব্‌শা (আবিসিনিয়া) থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাঁরা এই বন্দরেই অবতরণ করেন। এতে বোঝা যায় যে, এই বন্দরটি প্রাক-ইসলামী আমল থেকেই সুপরিচিত ছিলো। অনন্তর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে মিসর ও সিরিয়া বিজয়ের পর এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

অতঃপর খাল কেটে নীলনদ ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ সাধন করলে এটি প্রভূত মর্যাদার অধিকারী হয়। কেননা, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিলো মদীনা মুনাওয়ারা আর 'জার' ছিলো তারই নৌবন্দর।

মদীনা মুনাওয়ারার জন্যে চতুর্দিক থেকে এখানেই মালামাল এসে নামতো এবং এই 'জার' বন্দর থেকেই মুসলিম বাণিজ্যতরীগুলো হাব্‌শা, মিসর, এডেন, হিন্দুস্তান ও চীনদেশ পর্যন্ত যাতায়াত করতো।

ইসলামের প্রারম্ভকাল থেকেই এর শোভা-সৌন্দর্য ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'জার' কেবল নৌবন্দরই ছিলো না, মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যেরও পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিলো। এখানে বড় বড় মুসলিম পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ জন্মগ্রহণ করেন। বড় বড় অট্টালিকা নির্মিত হয়।

জারের বিপরীত দিকে সমুদ্র মাঝে এক বর্গমাইলের একটি দ্বীপ ছিলো। দ্বীপটির নাম ছিলো 'কারাফু'। সেখানে লোকজন নৌকায় যাতায়াত করতো। জারের ন্যায় এখানেও একটি মনোরম সওদাগর বসতি ছিলো।

উবাল্লা ঃ বসরার অদূরে দজলা (তাইগ্রিস) নদীর তীরে সুপ্রাচীন এক ইরানী নৌবন্দর ছিলো। নাম উবাল্লা। ইসলামী আমলে এটি কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিলো। ইসলাম-পূর্বকালে ইরানী সেনাছাউনি ও বাণিজ্য বন্দর ছিলো। চতুর্দশ হিজরীতে মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়। এখানে বিশেষভাবে চীন ও হিন্দুস্তানগামী জাহাজ থাকতো। এটি দখল করার দরুনই মুসলমানগণ পূর্ণরূপে ইরান দখল করতে সক্ষম হন। ২৫৬ হিজরী পর্যন্ত এর দব্‌দবা অক্ষুণ্ন ছিলো। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তার গুরুত্ব লোপ পায়।

বসরা ঃ এই নৌবন্দরটি হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশক্রমে চতুর্দশ হিজরীতে 'কারনা' ও 'শাতিল আরবের' মধ্যস্থলে নির্মিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্বের দরুন স্বল্পকালের মধ্যেই বসরা সমৃদ্ধি লাভ করে উবাল্লার দীপ্তিকেও ম্লান করে দেয় এবং ক্রমে ক্রমে চীন ও হিন্দুস্তানগামী জাহাজের এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের পর এর রওনক আরো বৃদ্ধি পায়। সিন্ধু ও বস্‌রার যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

সীরাফ ঃ এই নৌবন্দরটি হিজরী তৃতীয় শতকে বসরার অদূরে পারস্যোপসাগরে স্থাপিত হয়। এটিরও জৌলুস ছিলো অত্যাধিক। আরবের বাণিজ্য তরী এখান দিয়েই চীন ও হিন্দুস্তান যাতায়াত করতো।

এডেন ঃ য়ামন উপকূলে এডেন বন্দর অবস্থিত। সুপ্রাচীন নৌবন্দর। হিজরী তৃতীয় শতকে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলো। এডেন য়ামনের রাজধানী সানা'আর নৌবন্দর ছিলো। এখান দিয়ে হাব্‌শা, মানদাব, জেদ্দা, হিন্দস্তান ও চীনের বাণিজ্য তরী আসা-যাওয়া করতো। হিজরী চতুর্থ শতকে সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করে। এডেন বাজার খুবই জমজমাট ও মালামালে ভরপুর ছিলো।

সুহার ঃ সুহার আম্মানের রাজধানী ও নৌবন্দর ছিলো। হিজরী চতুর্থ শতকে এই বন্দরটি স্বীয় ঔজ্জ্বল্য, বৈভবের প্রাচুর্য ও বর্ণাঢ্য বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সানা'আর চাইতেও উন্নত ছিলো। সমকালীন পর্যটকদের ভাষায়ঃ সুহারের বাজারটি অত্যন্ত জৌলুসময়। গোটা সমুদ্র উপকূল জুড়ে বিস্তৃত। সুউচ্চ ও সুরুচিময় ঘরদোর শালকাঠ ও ইট দ্বারা নির্মিত। উপকূলে মিঠা পানির নহর প্রবাহিত।

জেদ্দা ঃ এ নৌবন্দরটি প্রাচীনকাল থেকেই আবাদ ছিলো। ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগেও এটি মক্কা মু'আজ্জমার নৌবন্দর ছিলো। অতঃপর আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, সিন্ধু ও ইরানে ইসলামের অগ্রগতির সাথে সাথে এরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অধুনা এটি বিশেষ করে প্রাচ্য দেশীয় হজ্জযাত্রীদের বন্দরে পরিণত হয়েছে।

শহর কুল্‌যুম ঃ লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এক বিরাট শহর ও নৌবন্দর ছিলো। বিশেষভাবে খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। যেসব সওদাগর মিসর থেকে হিজাজ ও য়ামনে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতেন এই বন্দরটিই তাঁদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো। এখানে বিভিন্ন দেশের সওদাগররা বসবাস করতেন।

ঈলা ঃ ঈলার বর্তমান নাম আকাবা। এটি ছিলো সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নৌবন্দর। ঈলা বন্দর লোহিত সাগরের পাড়ে সমৃদ্ধিশালী শহর ছিলো। এখানে সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্য তরী যাতায়াত করতো। ঈলা ছিলো হরেক রকম পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তর আফ্রিকার হজ্জযাত্রিগণ এই বন্দরেই অবতরণ করতেন।

ভূমধ্যসাগর সিরিয়ার উপকূল থেকে উত্তর আফ্রিকার 'জাবালুত্‌ তারিক' পর্যন্ত বিস্তৃত। মুসলমানদের ওপর রোমানদের আক্রমণ আশংকা বরাবরই লেগেছিলো। তাই মুসলমানরা সিরিয়ার উপকূলবর্তী 'সুর' নামক স্থানে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেছিলেন। আরবদের সমুদ্র বিজয় যতই আগু বাড়ছিলো, রোমানরাও ততই পিছু হটছিলো। বনু উমাইয়ার পর বনু আব্বাস মুসলিম নৌশক্তির অধিকারী হন। তাঁদের পর উত্তর আফ্রিকার অধিপতি হন উবায়দী ফাতিমী।

ফাতিমীদের রাজত্ব ভীষণ শক্তিশালী ছিলো। সিসিলী, সিরিয়া ও মিসরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ফাতিমিগণ নৌবাহিনী সম্পর্কে বড় উৎসাহী ছিলেন। এ ছাড়া, তাঁদের বেশির ভাগ পথই নৌ-নির্ভর ছিলো। তাই নৌ-উন্নয়ন তাদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা তিউনিসের পুরান নৌ-কারখানা সমৃদ্ধ করে তোলেন।

মাসীনা ঃ মাসীনা ছিলো সিসিলীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ও সামরিক বন্দর। এখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সওদাগররা বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য লেনদেন করতেন। মাসীনাতেই সিসিলীর সর্ববৃহৎ রণপোত কারখানা স্থাপিত হয়েছিলো।

পালার্মো ঃ পালার্মো ছিলো সিসিলীর রাজধানী ও বিশাল নৌবন্দর। এখানেও যুদ্ধ জাহাজের একটি বিরাট কারখানা ছিলো। হাজার হাজার শ্রমিক-মিস্ত্রী এই কারখানায় কাজ করতো।

মারীয়া ঃ মারীয়া স্পেনের সর্ববৃহৎ নৌবন্দর। এখান থেকে সওদাগররা জাহাজে আরোহণ করতেন। মস্তবড় বাণিজ্য ও রণপোত কেন্দ্র ছিলো। স্বীয় বিশালত্ব ও যাতায়াত সুবিধার জন্যে এটিকে স্পেনে প্রাচ্যের সিংহদ্বার বলা হতো। সাগরের পানি নগর দেওয়ালে এসে আছড়ে পড়তো। এখানে উন্নতমানের রেশমী কাপড় তৈরি হতো।

বিজায়া ঃ বিজায়া ছিলো উত্তর আফ্রিকা ও মরক্কোর সর্বাধিক পরিচিত নৌবন্দর। আলজিরিয়া ও তিউনিসের মাঝখানে অবস্থিত। প্রথমদিকে অতি সাধারণ নৌবন্দর ছিলো। ৪৫৭ হিজরীতে নাসির ইবন আল্‌নাস এটিকে উপযুক্ত নৌস্থল ভেবে আবাদ করেন। ফলে ক্রমে ক্রমে এক বিশাল নৌবন্দরে পরিণত হয়। এখান থেকে সর্বত্র জাহাজ চলাচল করতো।

সাব্‌তা ঃ এটি মরক্কোর বিখ্যাত নৌবন্দর ছিলো। স্পেনের উল্টো দিকে আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত। এক সময় পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম পোতাশ্রয় ছিলো।

মাহ্‌দীয়া ঃ ফাতিমী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ৩০০ (তিনশ') হিজরীতে আফ্রিকার উপকূলে মাহ্‌দীয়া নির্মাণ করেন। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে খ্যাতিমান বন্দর ছিলো। উপকূলের পাথর কেটে নির্মিত হয়েছিলো। এখানে একটি সুন্দর প্রবেশপথ ছিলো। শিকল দিয়ে বাঁধা হতো। জাহাজ ভিড়ার সময় শিকল খুলে ফেলে পুনরায় বেঁধে দেয়া হতো।

তিউনিস ঃ এই নৌবন্দরটি অতি সুপ্রাচীন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তিউনিস বন্দরকে জাহাজ নির্মাণের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন। মুসলমানদের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এই বন্দরটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলো। বলতে গেলে, এখান থেকেই মুসলমানদের জাহাজ নির্মাণ ও নৌ-চালনার অভিযাত্রা শুরু হয়েছিলো। এই বন্দরটি ছিলো অতি সুরক্ষিত ও অপার্থিব শক্তি মহিমায় মণ্ডিত। এখানে জাহাজ ভিড়ার পর সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যেতো। কোনো ঝড়-তুফানের আশংকা থাকতো না। এর সন্নিকটে দুটি প্রকাণ্ড ঝিল আছে। একটির নাম 'বারায্‌তা' ও আরেকটির নাম 'হাল্‌কুল ওয়দ'। দুই ঝিলের মাঝখানে একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। এই ভূখণ্ডটি কেটে ঝিল দুটিকে মিলিয়ে দিলে তিউনিস এমন এক সুবিস্তৃত নৌবন্দর হতে পারে, যেখানে ভূমধ্যসাগরের সকল নৌযান একত্রে থাকা সম্ভব।

শহর রশীদ ঃ হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগে মিসরের তিউনিস সাগরে বড় বড় জাহাজ চলাচল করতো। এখানে শহর রশীদ নামে একটি বর্ণোজ্জ্বল নৌবন্দর ছিলো। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো নীলনদের পানি সাগরে পতিত হওয়ার দরুন সাগরের জাহাজ অনায়াসেই নীল নদে প্রবেশ করতে পারতো।

শহর কাওস ঃ মামলুক আমলে এই বন্দরটি খুবই সরগরম ছিলো। এটি মস্তবড় উপকূলীয় শহর। মিসরের 'বন্দর সাঈদ' নামে খ্যাত। দক্ষিণ দেশ থেকে 'শূর' নদ দিয়ে জাহাজযোগে আগত সওদাগররা এখানে থামতেন। এডেনের সওদাগররাও এখানে থামতেন। নৌ-বাণিজ্যের দরুন এখানে বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ছিলো।

দামিয়াত ঃ এই বন্দরটির একপ্রান্ত নীলনদের সাথে এবং অপর প্রান্ত ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত ছিলো। এটি মিসরের সুবৃহৎ নৌবন্দর ছিলো। এখানে নৌযুদ্ধের মহড়া অনুষ্ঠিত হতো। দামিয়াতে দুটি মিনার ছিলো। মিনার দুটির সাথে লোহার মোটা শিকল টানা থাকতো। ফলে সরকারের বিনা অনুমতিতে এখানে কেউ জাহাজ নোঙ্গর করতে পারতো না।

আলেকজান্দ্রিয়া ঃ আলেকজান্দ্রিয়া মিসরের প্রাচীন নামকরা নৌবন্দরসমূহের অন্যতম। গ্রীকদের আমলে নির্মিত হয়েছিলো। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সৃষ্টি। সেই থেকে আজো তার ঔজ্জ্বল্য অম্লান। আলেকজান্দ্রিয়া মুসলিম আমলে একটি বিখ্যাত নৌবন্দর ছিলো।

ওপরে আমরা মুসলিম নৌবন্দরগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলাম। তোমরা বড় হয়ে আরো অনেক কথা জানতে পারবে। দেশের প্রতিরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে নৌবন্দর অত্যাবশ্যক।

যে সব দেশের কাছে নৌবন্দর নেই, তারা শক্তিশালী হতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামরিক শক্তির জন্যে নৌবন্দর, জাহাজ নির্মাণ ও নৌ-চালনা শিক্ষা অপরিহার্য। যে জাতির উন্নত নৌবন্দর আছে, যাদের নৌ-কারখানায় অহর্নিশ নির্মাণ কাজ চলে, যাদের নৌযান সাগরবক্ষ চিড়ে দেশ-দেশান্তরে নতুন নতুন জিনিসপত্র আমদানি-রফতানী করছে, তারা সত্যই সৌভাগ্যবান।

নাবিক সেজে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা তোমাদেরও কর্তব্য। আল্লাহ্ তোমাদের শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন। জাতির মান-মর্যাদা নৌশক্তিতেই নিহিত।

মুসলমানদের বাতিঘর

নক্ষত্র ছাড়া আরো কিছু নিদর্শন আছে, যার সাহায্যে তারা পথের দিশা লাভ করে।

(সূরা নাহল)

সমুদ্রপথে নৌ-চলাচলের সুবিধার্থে বিশেষ বিশেষ স্থানে বাতিঘর স্থাপন করা হয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ নক্ষত্র ব্যতীত আরো কিছু নিদর্শন আছে, যদ্দ্বারা তারা (মানুষেরা) পথের দিশা লাভ করে (সূরা নাহল)।

দুনিয়ার সবচেয়ে প্রচীন ও প্রথম বাতিঘর নির্মিত হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়। আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও আগে এ বাতিঘরটি নির্মিত হয়েছিলো। এর একশ' বছর পর সমুদ্রগামী জাহাজের পথ-নির্দেশক হিসেবে বিভিন্ন স্থানে বাতিঘর নির্মাণ করা হয়। সমুদ্রে জাহাজ চালনায় নক্‌শা অঙ্কনের পর দ্বিতীয় জরুরী জিনিস হচ্ছে বাতিঘর। মুসলমানগণ সমুদ্রে জাহাজ চালনার সময় এইসব বাতিঘর থেকে পথ-নির্দেশ লাভ করতেন।

মুসলমানদের বাতিঘরগুলোর আকার-আকৃতি ও রূপ-প্রকৃতি ছিলো এরূপঃ সমুদ্রের বিশেষ বিশেষ স্থানে বড় বড় খাম্বা গেড়ে তার ওপর বাতিঘর নির্মিত হতো। এইসব বাতিঘরে কিছু লোক অবস্থান করতো। তারা রাতের বেলা বাতি জ্বালিয়ে রাখতো এবং কোনো কারণে তা নিভে গেলে পুনরায় জ্বালিয়ে দিতো।

এইসব বাতিঘর সাধারণত জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক স্থানে তৈরি হতো। এর দ্বারা এটাই বুঝানো হতো যে, জাহাজ চলাচলের জন্যে এ স্থানটি বিপদসঙ্কুল। এখান থেকে জাহাজ দূরে রাখতে হবে। কিংবা এটি হচ্ছে একটি সামুদ্রিক নৌবন্দর। এখানে এসে জাহাজ থামবে।

মুসলমানরা আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরটি সযত্নে রক্ষা করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর দুনিয়ার অন্যতম আশ্চার্য বস্তু। এটি ২৭৫ ফুট উঁচু। আলেকজান্দ্রিয়ার সুবৃহৎ প্রাচীন নৌ-বন্দরের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

মুসলিম আমলে এই বাতিঘরে একটি আতশদান জ্বালিয়ে রাখা হতো। অনুরূপভাবে পারস্যোপসাগরেও বড় বড় খাম্বা পুঁতে এরূপ নিদর্শন তৈয়ার করা হতো।

মুসলিম শাসনামলে এইসব বাতিঘরের প্রচলন অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিলো। ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন গমনপথে আলোকস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিলো। মুসলমানগণ নৌ-উন্নয়নের সাথে সাথে বাতিঘরেরও উন্নয়ন সাধন করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর তৈরির পর রোমকরা বিভিন্ন স্থানে বাতিঘর তৈরি শুরু করে। অষ্টাদশ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের উপকূলে মাত্র ২৫টি বাতিঘর ছিলো। সমুদ্র মাঝে প্রথম বাতিঘর নির্মিত হয়েছিলো ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এই বাতিঘর নির্মিত হতো কাঠের দ্বারা। সর্বপ্রথম পাথরের বাতিঘর নির্মিত হয় ১৮০৭ খৃস্টাব্দে। ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার রবার্ট স্টিভিন্সন এই বিরাট বাতিঘরটি নির্মাণ করেন। ছয় লাখ টাকা ব্যয়ে চার বছরে এটি নির্মিত হয়।

মুসলমানরা এই প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটি দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে দান করেছেন। প্রথমদিকে এইসব বাতিঘর এক বিশেষ ধরনের তেল দ্বারা জ্বালানো হতো। অতঃপর বিদ্যুৎ আবিষ্কার হলে বিদ্যুৎ দ্বারাই তা প্রজ্বলিত হয়।

কোনো কোনো বাতিঘরে এখনো তেলের বাতি জ্বলে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ক্লিপ্সন দ্বীপে একটি বাতিঘর আছে। এই বাতিঘরটি এগারো লাখ ষাট হাজার মোমবাতি শক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ এগারো লাখ ষাট হাজার মোমবাতি জ্বালালে যতখানি আলো হয়, ওই বাতিঘরটির আলোও ঠিক ততখানি। এই বাতিঘরেও তেল ব্যবহৃত হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত 'কেপ ডি হিউ' নামক বাতিঘরটি সাম্প্রতিক বিশ্বে সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল। এই বাতিঘরের আলো হচ্ছে দুই কোটি পঁচিশ লাখ মোমবাতি শক্তিসম্পন্ন।

যে জাতির বাতিঘর উজ্জ্বল, সে জাতির কপালও উজ্জ্বল। বাতিঘরের আলো ও মাহাত্ম্য দ্বারাই একটি জাতির নৌশক্তি পরিমাপ করা যায়।

বর্তমানে পৃথিবীর শক্তিমান দেশগুলোর বারো হাজার বাতিঘর চালু রয়েছে। তন্মধ্যে তিন হাজার আমেরিকার উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত। এর কোনো কোনোটি আবার সমুদ্রের অতি বিপজ্জনক নৌপথে দণ্ডায়মান। এগুলোর অনির্বাণ দীপশিখা হাজার হাজার মানুষের প্রাণরক্ষা করছে। এটা আমেরিকান জাতির গৌরবের প্রতীক।

ইংল্যাণ্ডের উপকূল অঞ্চলে প্রায় তিনশ' আলোকস্তম্ভ আছে। এগুলো দিন-রাত নৌ-জাহাজকে পথ-প্রদর্শন করছে। এটা ইংরেজ দ্বীপাঞ্চলবাসীদের নৌ-তৎপরতারই

উজ্জ্বল নিদর্শন। যে জাতির আলোকস্তম্ভ আলোকযুক্ত, সে জাতির ললাটপিদিমও প্রদীপ্ত।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, নৌশক্তি প্রবৃদ্ধি করা। জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চালনায় অংশগ্রহণ করা। সমুদ্রভীতি উপেক্ষা করা। যে জাতির তরুণ সমাজ সাগরের ঝঞ্ঝাবর্ত ও সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতকে ভয় করে না, আল্লাহ্ তাঁদের নতুন জগৎ প্রদান করেন। বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তোমরাও এটা পরীক্ষা করে দেখো!

যে জাতি সমুদ্রকে ভয় করে, যে জাতির তরুণ সমাজ সমুদ্র তরঙ্গে প্রবেশ করতে অনীহ, আল্লাহ্ তাদের কেবল রাজত্বই ছিনিয়ে নেন না, তাদের মান-ইজ্জতও খতম করে দেন। সমুদ্রের উপকারিতা ও নৌ-সফরের হিতকারিতার আলোচনায় কুরআন মজীদ ভরপুর হয়ে আছে! কুরআন মজীদের নির্দেশ মতো যদি আমরা চলতাম, তাহলে দুনিয়ায় আমরা সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতাম। চেষ্টা করে দেখো! আল্লাহ্ কারো শ্রমই বৃথা নষ্ট করেন না।

সাত

সাগরবক্ষে মুসলমানদের আধিপত্য

তোমরা নৌযানগুলো পানির বুক চিরে সন্তরণ করতে দেখতে পাও, যাতে তোমরা বাণিজ্য করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ধন-সম্পদ) কুড়াতে সক্ষম হও এবং জাতি গঠন কার্যে তা ব্যয় করে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারো।

(সূরা ফাতির)

উত্থান যুগে মুসলমানরা ছিলো সারা বিশ্বজগতে উন্নতশির। তামাম দুনিয়ার সাগর-মহাসাগরেই তাঁদের আধিপত্য ছিলো প্রতিষ্ঠিত। পারস্য উপসাগর ছিলো প্রাচ্য দেশসমূহের নৌকেন্দ্র।

হিন্দুবাদ ও সিন্দবাদের কিস্‌সা তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। কি মজার কাহিনী তাই না! এসব কাহিনী কিন্তু ওই নৌকেন্দ্রের সাথেই জড়িত। এসব রূপকথা রচনার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমান জওয়ানদেরকে সাগর ভ্রমণ ও নৌ-অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

পূর্বাঞ্চলের নৌপথসমূহ হিন্দুস্তানের উপকূল ঘেঁষে চীন, জাভা, সুমাত্রা ও মালয় প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এই সমগ্র নৌপথই মুসলিম নাবিকদের কব্‌যায় ছিলো। এইসব নৌপথে শুধু ইসলামের ঝাণ্ডাই উড়তো না, বরং ওই বীর নাবিকদের বদৌলতে জাভা, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের আশীষবার্তাও পৌঁছে গিয়েছিলো। ফলে এইসব সাগরপথে মুসলমানদের নৌ-চালনা ছিলো শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যভিত্তিক। মুসলিম সওদাগররা জাহাজযোগে চীন ও ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্যদ্রব্য পশ্চিম দেশে পৌঁছে দিতেন।

ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের নৌশক্তি ছিলো জঙ্গী নৌবহরের। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী প্রায় সবগুলো জাতিই ছিলো নৌবহরের অধিকারী। নৌযুদ্ধেও ছিলো তারা পারদর্শী। তাই মুসলমানদেরও নৌবহর সংগঠন ও রণপোত কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ফলে অনতিকালের মধ্যেই ভূমধ্যসাগর মুসলিম অধিকারে আসে। দুনিয়ার কোনো নৌশক্তিই তাঁদের মুকাবিলা করতে পারতো না।

মুসলিম শাসন কায়েমের পর যখন তাঁদের নৌ-কর্তৃত্বও হাসিল হলো, তখন বিভিন্ন পেশার লোক তাঁদের নিকট চাকরিপ্রার্থী হলো। মুসলমানরা মাঝি-মাল্লা ও নাবিকদেরকে চাকরি দিলেন। তাঁদের সমুদ্রজ্ঞান ও নৌ-দক্ষতা বৃদ্ধি পেলো। বড় বড় নাবিক ও নৌ-বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হলো। নৌযুদ্ধের উৎসাহ বাড়লো। যুদ্ধ-জাহাজ বানালেন। সেগুলোকে নৌসেনা ও অস্ত্রসজ্জিত করলেন। নৌবাহিনীকে সমুদ্র-পৃষ্ঠে সওয়ার করালেন। ভূমধ্যসাগরের অপর পারে লড়তে পাঠালেন।

নৌযুদ্ধের জন্য মুসলমানরা সিরিয়া, আফ্রিকা, মরক্কো ও স্পেনের উপকূল বেছে নিলেন। আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান আফ্রিকার গভর্নর হাস্‌সান ইব্‌ন নু'মানকে তিউনিসে জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলেন।

তিনি তিউনিসে এক বিশাল জাহাজ নির্মাণ কারখানা কায়েম করেন। এই কারখানার জাহাজে ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলো ছেয়ে যায়। সেকালের-তিউনিস ছিলো মুসলমানদের এক বিশাল নৌকেন্দ্র।

এই কেন্দ্র থেকেই সিসিলীতে গালবিয়া শাসনামলে যিয়াদাতুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম আগলাব সাকালিয়ায় নৌ-হামলা চালান। সাকালিয়া পদানত ও কাওসারা বিজিত হয়।

আগলাবিয়াদের পর উবায়দিয়া ও উমাইয়া শাসনামলে আফ্রিকা ও স্পেনের নৌবহরগুলো অপর পারে হামলা চালাতো। আবদুর রহমান আন্‌নাসিরের আমলে স্পেনীয় নৌবহরে প্রায় দু'শ' রণপোত ছিলো। আফ্রিকার নৌবহরেও সমসংখ্যক যুদ্ধ-জাহাজ ছিলো।

স্পেনীয় আমীরুল বহর (নৌবাহিনী প্রধান) ছিলেন ইব্‌ন রামাহাস। আর এই জাহাজগুলোর কেন্দ্রীয় বন্দর ছিলো বিজায়া ও মারীয়া। প্রতিটি নৌবন্দরে আবার একজন উচ্চতর কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকতেন। তিনি সমস্ত জাহাজ, জাহাজের কাপ্তান ও নৌসেনাদের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি জাহাজের কাপ্তানকে বলা হতো 'রঈস' বা সর্দার। রঈস তাঁর জাহাজের পূর্ণ তদারককারী ছিলেন।

যুদ্ধ বাধলে সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ বন্দরে একত্রিত করে রণসম্ভারে সজ্জিত করা হতো এবং একজন আমীরের অধীনে যুদ্ধে পাঠানো হতো।

সোনালী যুগে ভূমধ্যসাগরের সামরিক ঘাঁটিগুলো মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। খৃষ্টান নৌশক্তি ছিলো মুসলমানদের তুলনায় অতি নগণ্য। ফলে সর্বত্রই মুসলমানদের নৌ-বিজয় সূচিত হয়। ভূমধ্যসাগরের গোটা উপকূলভাগ অধিকৃত হয়। বিশেষ করে মীওরকা, মানওরকা, ইয়াবিসা, সারদানিয়া, সাকালিয়া, কাওসারা, মাল্টা, ক্রীট ও সাইপ্রাস প্রভৃতি এলাকা।

আবুল কাসিম ও তাঁর পুত্রগণ ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত বন্দর 'মাহদীয়া' থেকে নৌবহর নিয়ে বের হতেন এবং ইউরোপের উপকূলভাগে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা কব্‌যা করতেন।

দানীয়ার ওয়ালী মুজাহিদ আমিরী ৪০৫ হিজরীতে তাঁর নৌবহর দিয়ে সারদানিয়া দখল করেন। মুসলমানরা তখন গোটা ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলভাগ শাসন করতেন।

ইবনে হুসায়ন খান্দানের আমলে মুসলিম নৌবহর খৃষ্টান নৌবহরের ওপর এমনভাবে হামলা করতো, যেমনিভাবে বাজপাখি তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন সমগ্র সমুদ্র এলাকায় মুসলমানদের প্রভুত্ব কায়েম ছিলো।

যুদ্ধ ও শান্তি সব সময়েই সাগরময় মুসলিম রণতরীর আনাগোনা লেগে থাকতো। কিন্তু খৃষ্টানদের একটি তখ্তাও ভূমধ্যসাগরে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

উবায়দী আমলে যখন মুসলিম নৌশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো, তখন খৃষ্টান নৌবহর ক্রুশেডারদের নিয়ে সিরিয়া ও মিসরের উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তার শুরু করে।

কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন উবায়দীদের উৎখাত করে সিরিয়া ও মিসর উপকূল থেকে খৃষ্টানদের তাড়িয়ে দেন। সালাহুদ্দীন মুসলিম নৌবহরেরও উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি আক্কায় এক বিরাটকায় নৌ-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারখানায় যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হতো। সিরীয় উপকূল ছাড়া আরেকটি নৌকেন্দ্র ছিলো আলেকজান্দ্রিয়ায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি মিসরের গভর্নরকে লিখে পাঠান যে, "অতি সত্বর জাহাজ বোঝাই করে খাদ্যদ্রব্য ও বীরসেনাদের পাঠিয়ে দাও।"

এই জাহাজগুলো সিরীয় উপকূলে পৌছামাত্র খৃষ্টান জাহাজগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম জাহাজগুলো বীরত্বের সাথে লড়াই করে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় তীরে পৌছায়।

উবায়দী বংশের পতনের পর মুসলিম নৌবহরের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। অবশ্য আফ্রিকার কয়েকটি বন্দরে কিছুসংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ অবশিষ্ট ছিলো।

মরক্কান নৌবহরের অবস্থা ভালোই ছিলো। তাদের ওপর তখনো কোনো আঘাত আসেনি। লামাতুনার শাসনকাল পর্যন্ত আরব নৌবহরের শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিলো। অতঃপর মুয়াহহিদ্দের শাসনকাল শুরু হয়। তাঁরাও এই নৌশক্তিকে সমুন্নত রাখেন। মুয়াহহিদদের উত্থানকালে স্পেন ও আফ্রিকায় মুসলিম নৌবহরের আধিপত্য কায়েম ছিলো। মুয়াহহিদ্দের নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন আহমদ সাকালী। তিনি সিসিলীর অধিবাসী ছিলেন।

মুসলমানদের গৌরবময় যুগে যুদ্ধের লীলাকেন্দ্র ভূমধ্যসাগরে তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিলো। তখন মুসলমানদের বিনা অনুমতিতে ভূমধ্যসাগরে অন্য কোনো জাতির যুদ্ধ জাহাজ প্রবেশ করতে পারতো না।

মুসলিম রণপোতগুলো তখন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো শিকারের অন্বেষণে হন্যে হয়ে বেড়াতো এবং শিকারের খোঁজ পাওয়ার সাথে সাথে অকস্মাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। অন্য কথায়, শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ দেখামাত্রই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতো। এভাবে সমগ্র সমুদ্র এলাকায় মুসলমানদের একাধিপত্য কায়েম হয়েছিলো।

কিন্তু বাষ্প-যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের পতনযুগও শুরু হলো। মুসলমানরা তখন আরামপ্রিয় হয়ে গেলো। তারা স্থলভাগের রাজত্বেই সন্তুষ্ট রইলো। সমুদ্রের তরঙ্গময় জীবনকে ভয় পেলো। ফলে মুসলমানদের নৌশক্তি চিরতরে খতম হয়ে গেলো।

আমাদের কর্তব্য এখন পুনরায় নৌশক্তি অর্জন করা। আমাদের তরুণ, কিশোর ও যুব সমাজ যখন সমুদ্র-তরঙ্গের সাথে লড়াই করতে শিখবে, সমুদ্রের অভিজ্ঞান লাভ করবে, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চালনায় পারদর্শী হবে, ঠিক তখনই আমরা আমাদের হারানো নৌশক্তি ফিরে পাবো। এটা এক সর্বসম্মত সত্য যে, যে জাতির কাছে নৌশক্তি নেই, সে জাতি দুনিয়ায় চিরদিনই দুর্বল হয়ে থাকবে।

কুরআন পাক নদনদী, নৌযান ও নৌভ্রমণকে আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত ও নিয়ামত বলে অভিহিত করেছে। একথা তোমরা এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই পড়ে এসেছো। তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

যে জাতির নৌবহর মযবুত, দুনিয়াতে সে-ই রাজত্ব করার যোগ্য। দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্যই তার হাতের মুঠোয়। যার নৌশক্তি কমযোর, সে দুনিয়ায় বাস করার অযোগ্য।

আট

মুসলিম নৌবহরের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মু'আবিয়া (রা)

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) নৌ-অভিযানের সূচনা করেন। তিনি মুসলিম নৌবহরকে সময়ের সর্বোন্নত নৌবহরে পরিণত করেন। মুসলিম নৌবাহিনী দুর্জয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

— জনৈক ঐতিহাসিক

মু'আবিয়া নাম। আবূ আবদুর রহমান কুনিয়াত বা পিতৃবাচক উপনাম। পিতার নাম আবূ সুফিয়ান। আবূ সুফিয়ান কুরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট খান্দানের অধিকারী ছিলেন। কুরাইশ বংশের ঝাণ্ডা তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিলো।

আবূ সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দা মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের উৎপীড়নে উভয়ই অগ্রণী ছিলেন। ইসলামের মূলোৎপাটন করতে এঁরা কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি।

মক্কা বিজয়ের দিন আবূ সুফিয়ান, হিন্দা ও মু'আবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার আগে আবূ সুফিয়ান ইসলামের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করলেও মু'আবিয়া বিশেষ কোনো বৈরিতা পোষণ করতেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর, উহুদ প্রভৃতি কোনো বড় যুদ্ধেই তিনি কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করেন নি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মু'আবিয়া হুদায়বিয়ার সন্ধির পর গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন না। মক্কা বিজয়ের পর তিনি প্রকাশ্যে মুসলমান হন।

কথিত আছে, মু'আবিয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুবারকবাদ জানান। মুসলমান হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি হুনায়ন ও তাইফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ওপর 'ওহী' লেখার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।

আমীর মু'আবিয়ার বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ ঘটে প্রথম হযরত আবূ বক্র সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে। তিনি তখন সিরিয়া অভিযানে ভ্রাতা ইয়াযীদ ইব্ন সুফিয়ানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন সুফিয়ান তখন সিরীয় বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক ছিলেন।

সিরিয়া অভিযানে মু'আবিয়া বড় বড় কীর্তি প্রদর্শন করেন। রোমান বাহিনীর সাথে লড়াই করতে তিনি আমোদ অনুভব করতেন। সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

সিরিয়া বিজয়ের পর মু'আবিয়ার ভ্রাতা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফিয়ান সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে হযরত উমর (রা) গভীর শোকাভিভূত হন। কেননা, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফিয়ান সৈন্য সংগঠন ও রাজ্য শাসনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন।

হযরত উমর (রা) মু'আবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। কারণ, মু'আবিয়া ছিলেন সরেস অন্তঃকরণের সুপুরুষ। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও অমিতসাহসিকতার জন্য হযরত উমর (রা) তাঁকে 'কিস্‌রা-ই-আরব' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে মু'আবিয়া চার বছরকাল সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। সিরিয়ায় শান্তি-শৃংখলা, দেশ শাসনব্যবস্থা ও সৈন্য-বিন্যাসে তিনি এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

মু'আবিয়া গোড়াতেই রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সিরিয়ায় রোমান স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী দুই-ই পাশাপাশি অবস্থান করতো। সিরিয়ার উপকূল অঞ্চলে তাই রোমের স্থলবাহিনী ও নৌবহরের যুগল সমাবেশ ঘটেছিলো।

মু'আবিয়া স্থলযুদ্ধে রোমানদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম ছিলেন। আর ওইসব যুদ্ধে তিনি সর্বদা সফলকামও হতেন। কিন্তু নৌবহরের কোনো জবাব তাঁর কাছে ছিলো না। মুসলমানদের নৌবাহিনী না থাকায় তাঁরা সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। রোমান নৌবহর এসে বারংবার উপকূল-ভাগে হামলা, আমীর মু'আবিয়া এসব ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করছিলেন। তাঁর অন্তরাত্মা মুসলিম নৌবহর প্রতিষ্ঠাকল্পে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। কেননা, তিনি পাল্লায় পড়েছিলেন রোমান যুদ্ধবাযদের। আর একটি শক্তিমান নৌবহর ছাড়া রোমকদের সম্পূর্ণ পরাজিত করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিলো না।

ঘটনার এই প্রেক্ষাপটে আমীর মু'আবিয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট এইমর্মে এক দরখাস্ত পেশ করেন যে, রোমানদের যথোচিত মুকাবিলা নিবন্ধন মুসলিম নৌবহর গঠন করা আবশ্যক।

হযরত উমর (রা) তখন মু'আবিয়াকে নৌবহর গঠনে হাত দিতে বারণ করেন। হযরত উমর (রা) সে সময় মুসলিম নৌবহর গঠনকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে তখন নৌবহর প্রতিষ্ঠার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়েছিলো।

কিন্তু আমীর মু'আবিয়া এরপরও অধিক পীড়াপীড়ি করতে থাকলে হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে অন্যান্য গভর্নরের পরামর্শ চেয়ে পাঠান। তাঁর তখনো পর্যন্ত মুসলিম নৌবহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফলে হযরত উমর (রা) মু'আবিয়ার আবেদন নাকচ করে দেন।

হযরত উমর (রা) শাহাদতবরণ করলে হযরত উসমান (রা) মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত হন। তাঁর খিলাফতকালেও আমীর মু'আবিয়া একইভাবে নৌবাহিনী গঠনের আবেদন পেশ করেন। হযরত উসমান (রা) তাঁর আবেদন মনজুর করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেন যে, নৌবাহিনীতে লোক ভর্তির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক হতে হবে। কাউকেই এ ব্যাপারে জবরদস্তি করা চলবে না।

অনুমতি পেয়ে আমীর মু'আবিয়া অতি দ্রুত মুসলিম নৌবহর গঠনে তৎপর হন এবং অনতিকালের মধ্যে একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে আটাশ হিজরীতে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। সাইপ্রাসবাসীরা টাল সামলাতে না পেরে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্তগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ

১. মুসলমানদের বার্ষিক সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর দেয়া হবে। রোমকদেরও সমপরিমাণ অর্থ দান করা হবে। মুসলমানদের তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না।

২. সাইপ্রাস কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তার মুকাবিলার যিম্মাদার হবে না।

৩. মুসলমানরা রোম আক্রমণ করতে চাইলে সাইপ্রাস তাঁদের জন্যে পথ ছেড়ে দিবে।

এই অঙ্গীকারের চার বছর পর বত্রিশ হিজরীতে সাইপ্রাস সন্ধির বরখিলাফ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমকদের যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে।

আমীর মু'আবিয়া তেত্রিশ হিজরীতে পাঁচশ' রণপোতবিশিষ্ট এক বিরাট নৌবহরসহ ভূমধ্যসাগরে অবতীর্ণ হন এবং সাইপ্রাসের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। প্রথম দফায়ই সাইপ্রাস মুসলিম বাহিনীর করতলগত হয়। আমীর মু'আবিয়া সাইপ্রাস দ্বীপে এগারো হাজার মুসলমানকে পুনর্বাসিত করেন।

তিউনিস, আলজিরিয়া ও মরক্কো–আফ্রিকার এইসব উপকূলীয় অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে এইসব এলাকায় রাশি রাশি রোম সৈন্য নিহত হয়। এ কারণে রোমের কায়সর (কায়সর প্রাচীন রোম সম্রাটদের উপাধি) প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেন।

কায়সর মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার মানসে বিরাট সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কায়সর কখনো এতবড় সামরিক আয়োজন গ্রহণ করেন নি। রোমান রণপোতের সংখ্যা ছিলো ছয়শ'। আমীর মু'আবিয়াও তাঁর উপযুক্ত জবাব দান মানসে স্বীয় রণবহরসহ সামনে অগ্রসর হন। এমন সময় সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়। অগত্যা উভয়পক্ষই তখন একরাতের জন্যে আপসে সন্ধিবদ্ধ হন। উভয়পক্ষই যার যার মতো আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হন।

পরদিন ভোরে রোমান বাহিনী যুদ্ধের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুত হলো। মুসলিম বাহিনীও সামনে উপস্থিত হলো। রোমান বাহিনী হঠাৎ হামলা শুরু করলো। মুসলিম বাহিনীও চকিতে পাল্টা জবাব দিলো।

উভয় তরফ থেকেই তরবারি চলতে লাগলো। ঘোরতর যুদ্ধের ফলে সাগরের পানি রক্তে লাল হয়ে উঠলো।

যুদ্ধস্থল থেকে উপকূল পর্যন্ত রক্তের ঢেউ খেলছিলো। দুই তরফেরই বীর যোদ্ধারা কেটে কেটে সাগরে পড়ছিলো। আর সাগরের পানি তাদের উছলে উছলে দূরে নিক্ষেপ করছিলো। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকলো। আমীর মু'আবিয়া স্বীয় স্থির সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে সৈন্য পরিচালনা করতে লাগলেন। পরিশেষে রোমান বাহিনীর কদম দুলে উঠলো এবং রোমান নৌবাহিনী প্রধান লঙ্গর তুলে পলায়ন করলেন।

রোমকদের নৌযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর আমীর মু'আবিয়া ভূমধ্যসাগরকে জঞ্জালমুক্ত করলেন। রোমকদের ধাওয়া করতে করতে কনস্টান্‌টিনোপল উপসাগরের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। মোটের ওপর, পূর্ণ আটঘাট বেঁধেই আমীর মু'আবিয়া রোমকদের মুকাবিলায় নেমেছিলেন। তিনি রোমকদের যেমন স্থলযুদ্ধে মার দিয়েছিলেন, তেমনি তাদের নৌযুদ্ধেও পর্যুদস্ত করেছিলেন।

এরপর আভ্যন্তরীণ কোন্দলের দরুন কিছুদিন মুসলমানদের বিজয়াভিযান মুলতবী থাকে। কিন্তু চুয়াল্লিশ হিজরীর দিকে এই কোন্দল স্তিমিত হওয়ার পর আমীর মু'আবিয়া পুনরায় তাঁর নৌ-তৎপরতা শুরু করেন। রোমকদের নৌ-মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আমীরুল বহরকে পাঠাতে লাগলেন। তাঁরা খুব সফলভাবেই রোমানদের মুকাবিলা করেন।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পুত্র আব্দুর রহমান কয়েকবার রোমকদের সার্থক মুকাবিলা করেন। বুস্‌র ইব্‌ন আবী আর্‌য়া ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌবহর রেস্‌ দিয়ে ফিরতেন।

উনপঞ্চাশ হিজরীতে মালিক ইব্‌ন হুবায়রা রোমকদের সাথে যখন-তখন যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। ফুযালা, খিরা জয় করে বিপুল মালে-গনীমত হাসিল করেন। অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন শাজ্‌রা রাহাবী বহুবার নৌ-হামলা চালিয়ে রোমান নৌশক্তিকে তছনছ করে দেন।

আটচল্লিশ হিজরীতে উক্‌বা ইব্‌ন আমির মিসরীয় বাহিনীর সাথে নৌযুদ্ধে লিপ্ত থাকেন।

এইসব সামরিক অভিযান ছিলো নৌযুদ্ধের মহড়াস্বরূপ। আমীর মু'আবিয়া এইসব নৌ-মহড়ায় অতি পুলক বোধ করতেন। তাঁর মনস্কামনা ছিলো মুসলিম নও-জওয়ানদের নৌযুদ্ধে পারদর্শী করে তোলা। তাই আমীর মু'আবিয়ার আমলে বিপুলসংখ্যক মুসলিম আমীরুল বহর সৃষ্টি হন এবং তাঁরাই রোমান শক্তিকে চিরতরে খতম করে দেন।

আমীর মু'আবিয়া কনস্টান্‌টিনোপল আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের জন্যে তিনি স্থল ও নৌবাহিনীকে সংগঠিত করেন। কনস্টান্‌টিনোপলের অত্যধিক গুরুত্ব ছিলো। কারণ, কনস্টান্‌টিনোপল ছিলো পূর্ব ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র।

আমীর মু'আবিয়া কনস্টান্‌টিনোপল আক্রমণ করে খৃষ্টান শক্তিসমূহ বিশেষ করে রোমকদের বিতাড়িত করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। তদুপরি একটি মুসলিম নৌবহর গঠন করাও ছিলো তাঁর ঐকান্তিক অভিলাষ।

তাঁর এই অভিলাষের কারণেই ভূমধ্যসাগর মুসলিম নৌবহরের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হলো। আমীর মু'আবিয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিলো ভূমধ্যসাগরের সবগুলো দ্বীপ দখল করে সিরিয়া, আনাতোলিয়া ও মিসর পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলাঞ্চলসমূহকে রোমকদের নৌ-হামলা থেকে চির নিরাপদ রাখা।

উনপঞ্চাশ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া সুফিয়ান ইব্‌ন আওফের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। এই রণবহরটি ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গের সাথে খেলতে খেলতে বসফোরাস প্রণালীতে প্রবেশ করে। কনস্টান্‌টিনোপল রোমকদের মস্তবড় সমরকেন্দ্র ছিলো। তারা মুসলমানদের মুকাবিলা করলো এবং তীব্রভাবেই করলো। ফলে মুসলমানদের পিছু হটতে হলো। কনস্টান্‌টিনোপল অজেয় থাকলো।

যা হোক, আমীর মু'আবিয়ার আমলে মুসলমানদের বছরে অন্তত কয়েক দফা করে রোমকদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হতো। এইসব যুদ্ধে মুসলমানরা অনেকগুলো দ্বীপ দখল করেন।

তিপ্পান্ন হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া আনাতোলিয়ার অদূরবর্তী রোডস দ্বীপ অধিকার করেন। এই দ্বীপটি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। আমীর মু'আবিয়া এটি দখল করে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন।

অনুরূপভাবে চুয়ান্ন হিজরীতে তিনি কনস্টান্টিনোপলের সন্নিহিত ইরওয়াদ দ্বীপ দখল করে সেখানেও মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন। এই সময় সাকালিয়া দ্বীপেও মুসলমানরা হামলা করেন, কিন্তু তা বিজিত হয়নি।

ষাট হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া ইনতিকাল করেন। তাঁর গোটা শাসনকাল হচ্ছে উনিশ বছর তিন মাস। তিনি মুসলিম নৌবহর গঠনের ক্ষেত্রে যে সংকল্প, দৃঢ়তা ও স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাঁর সংগঠিত নৌবাহিনীই অভিজ্ঞ রোমান নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছিলো।

তাঁর শাসন আমলেই মুসলিম নৌবহরের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই মুসলিম নৌবহর সুবিখ্যাত রোমান নৌবহরকেও ছাড়িয়ে যায়।

আমীর মু'আবিয়া কেবল মুসলিম নৌবহরেরই প্রতিষ্ঠাতা নন, বরং জাহাজ নির্মাণেরও তিনিই সূচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর শাসন আমলে বেশ ক'টি জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসরের উপকূলে কারখানা নির্মাণ করেন।

আমীর মু'আবিয়া স্বতন্ত্র নৌ-বিভাগ কায়েম করে তার উন্নয়ন বিধান করেন। রণবহর, নৌসেনা, নৌ-সমরোপকরণ ও তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এই বিভাগেরই অধীন ছিলো।

নয়

উমাইয়া যুগে মুসলিম নৌবহর

উমাইয়া যুগে মুসলিম পোতাশ্রয়গুলো নৌবহরে পূর্ণ থাকতো। কেননা, তাদের রোমান নৌবহরের সাথে পাঞ্জা লড়তে হতো।

— জনৈক ঐতিহাসিক

উমাইয়াদের গোটা শাসনকালই ছিলো বিজয় অভিযান ও শান-শওকতপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ সর্বদা লেগে থাকলেও ফৌজী দৃষ্টিকোণ থেকে উমাইয়া শাসন খুব মজবুত ছিলো।

ভূমি ও পানি উভয়ক্ষেত্রেই উমাইয়াদের বিজয় অভিযান ছিলো। আমীর মু'আবিয়া কেবল মুসলিম নৌবহর প্রতিষ্ঠাই করেন নি, তিনি তাঁর শাসনকালে তা সমুন্নত ও সুদৃঢ়ও করেছিলেন। তার বিশদ বিবরণ তোমরা পূর্বেই পড়েছো। এখানে আমরা তাঁর উত্তরসুরিদের কিছু কীর্তিকথা তুলে ধরবো মাত্র।

আমীর মু'আবিয়া সতেরো শ' সশস্ত্র রণতরী রেখে যান। তাঁর পরে মুসলিম নৌবহরের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়। নৌযুদ্ধে নতুন নতুন এলাকা অধিকৃত হয়।

ইয়াযীদের শাসনকালে মুসলিম বিজয়াভিযান আফ্রিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। এ কারণে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌবহরের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো তা নিহায়ত শক্তিশালী অবস্থায় রাখা। তাই মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত সকল নৌবন্দরেই নৌ কর্মকাণ্ডের সুবন্দবস্ত ছিলো।

ইয়াযীদের শাসনামলে উত্তর আফ্রিকার বন্দরগুলো নৌবহরে ভরপুর হয়ে থাকতো। তার কারণ ছিলো রোমান নৌবহরের মুকাবিলা করা। এই সময় বহুবার মুসলিম নৌবহরের হাতে রোমান নৌবহরের নিষ্করুণ বিপর্যয় ঘটে। যেসব কীর্তিমান পুরুষ মুসলিম নৌবহরের নেতৃত্ব দেন, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স হারিছী ও জানাদা ইব্ন আবী উমাইয়ার নাম সমধিক পরিচিত। তাঁরা স্বীয় বীরত্ব ও অমিততেজ বলে রোমান নৌবহরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন।

এইসব জানবায বীর সেনানীই সাইপ্রাস, রোডস ও ক্রীট দ্বীপপুঞ্জ জয় করেন এবং সেগুলো রক্ষাকল্পে সেখানে নৌবহর প্রস্তুত রাখেন।

এ ছাড়া ইয়াযীদের সময় কয়েকবার কনস্টান্টিনোপলে স্থলাভিযানের সাথে সাথে নৌ-হামলাও করা হয়। আফ্রিকার উপকূল রক্ষার্থে সেখানকার বন্দরগুলোতে বিরাট

নৌবহর মোতায়েন ছিলো। আরব মুসলমানরাই গোটা নৌ-ডিপার্টমেন্টটি পরিচালনা করতেন।

ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের শাসনকালে আটাশি হিজরীতে মুসলিম নৌবহর পুনর্গঠিত হয়। দুটি কারণে এই পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১. মুসলিম অধিকৃত ভূমধ্যসাগরীয় আফ্রিকান উপকূল রক্ষার্থ নৌবহরের প্রয়োজন ছিলো। আর নৌবহর পুনর্গঠন ব্যতীত তা সম্ভবপর ছিলো না।

২. রোমান নৌশক্তির মুকাবিলা হেতু ভূমধ্যসাগরের মেওরকা ও মানোরকা দ্বীপ দুটি দখল করা দরকার ছিলো। কেননা, উত্তর আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে রোমান নৌবাহিনী উপর্যুপরি হামলা করে চলছিলো।

সারডিনিয়া ভূমধ্যসাগরের একটি বিখ্যাত দ্বীপ। শস্য-শ্যামল ও চিরহরিতের জন্যে এর বড় শুহ্‌রাত। আয়তনেও বেশ বড়সড়। মুসলিম নৌবহর তার উপর হামলা করলো। সারডিনিয়াবাসীরা কোনো প্রতিরোধই করলো না। বিনাযুদ্ধে সারডিনিয়া অধিকৃত হলো।

ওই সময় মুসলিম নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের আরো কতিপয় দ্বীপাঞ্চল দখল করে ফেললো। রোমান নৌশক্তি মুসলিম নৌবহরের নিকট ফিকে ও বিবর্ণ হয়ে পড়েছিলো।

ওয়ালীদ যুগে আফ্রিকার উপকূলে নতুন নতুন জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়। অনুরূপ সিরিয়া ও মিসরের পুরান কারখানাগুলোও পুনর্গঠিত হয়।

হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিকের শাসনামলে স্থল-অভিযানের সাথে সাথে নৌ-অভিযানও পুনরারম্ভ হয়। এদিকে কিছুদিন থেকে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌ-অভিযান থমকে পড়েছিলো। হিশামের বিখ্যাত আমীরুল বহর ইব্‌ন হিজাব পুরাতন জাহাজ কারখানাগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি কতিপয় নতুন কারখানাও স্থাপন করেন।

একশ' সতেরো হিজরীতে হাবীব ইব্‌ন আবী উবায়দার নেতৃত্বে সারদানিয়ার নৌ-অভিযান শুরু ও কামিয়াব হয়। মুসলিম নৌবাহিনী গোটা দ্বীপাঞ্চল দখল করে সেখানে একটি নৌ-ছাউনি স্থাপন করেন।

রোমকরা সাকালিয়ায় স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করেছিলো। কিন্তু হিশাম যুগে একশ' বাইশ হিজরীতে হাবীব সাকালিয়া আক্রমণ করেন। সাকালিয়ার বিখ্যাত শহর ও নৌবন্দর সারকাওসা বিজিত হয়। দ্বীপের অভ্যন্তরে স্থলযুদ্ধে হাবীবের খ্যাতিমান বীর পুত্র আবদুর রহমান রোমান বাহিনীকে বিপুলভাবে পর্যুদস্ত করেন। হাবীবের ইরাদা ছিলো পুরো দ্বীপাঞ্চলটি অধিকার করা। কিন্তু এই সময় উত্তর আফ্রিকায় বারবারদের

ঘোর বিদ্রোহ শুরু হয়। এখানে ফৌজী শক্তি অপ্রতুল ছিলো। তাই ইব্‌ন হিজাব হাবীবকে ফেরত ডেকে পাঠান।

মোটের ওপর, হিশামের শাসনকাল মুসলিম শান-শওকতের স্বর্ণযুগ ছিলো। এ সময় সবদিকে সমৃদ্ধি সাধিত হয়। বিশেষত ফৌজী নিজাম সুবিন্যস্ত ছিলো। সিপাহ্‌সালার ও আমীরুল বহর সুদক্ষ ছিলেন। তাই নৌ-অভিযানসমূহও অব্যর্থ ছিলো।

প্রশাসনিক অগ্রগতির সাথে সাথে সামরিক উন্নতিও বৃদ্ধি পায়। সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মজবুত কিল্লা তৈরি হয়।

মুসলিম ও রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ইন্‌তাকিয়ায় কাতারগাশ, বোরা ও বুফা নামক তিনটি সুবৃহৎ মজবুত দুর্গ নির্মিত হয়। এছাড়া, সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল সুদৃঢ় করে সেখানে সবরকম সমরোপকরণ সন্নিবেশ করা হয়।

গোটা নৌব্যবস্থাপনা পুনরায় ঢেলে সাজানো হয়। নৌবহরের মানোন্নয়নকল্পে নতুন নতুন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। উত্তর আফ্রিকায় নৌবন্দরগুলো মেরামত করা হয়। উপযুক্ত স্থানসমূহে নৌ-কারখানা স্থাপন করা হয়। ভূমধ্যসাগরে সফল নৌ-আক্রমণ চালিয়ে রোমান নৌ-শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়।

উমাইয়াগণ মাটি ও পানিতে ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুন্নত রাখেন। ভূমির উচ্চ শিখরে ইসলামের বিজয় কেতন সগর্বে উড়তে থাকে। মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় সদা ব্যাপৃত থাকে।

মুসলিম নৌবহর ভূমধ্যসাগরের পৃষ্ঠদেশে সর্বক্ষণ চক্কর দিতে থাকে। রোমান নৌবহরগুলো মুসলিম নৌবহর থেকে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াতো, যেমনিভাবে পালিয়ে বেড়ায় ছোট ছোট পাখিরা বাযপাখির ঝাঁপটা থেকে।

আহা! আজকের মুসলিম শাসকরা যদি তাঁদের এই বুনিয়াদী দুর্বল দিকটির প্রতি একটু নজর দিতেন, তা হলে ইসলামের সেই সোনালী যুগ আবার ফিরে আসতো। শুধু একটু ইচ্ছার প্রয়োজন।

দশ

আব্বাসীয় আমলে মুসলিম নৌবহর

আব্বাসীয়গণ স্বীয় গৌরব যুগে মুসলিম নৌবহরের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালান এবং অবিরাম রোমান নৌবহরের সাথে সাগরবক্ষে যুদ্ধমান থাকেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

আব্বাসীয় আমলে মুসলিম জয়যাত্রা কতকটা থিতিয়ে পড়েছিলো। কারণ, তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিলো। মুসলিম দেশসমূহের নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা বিধান করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। তাই দেশের নিরাপত্তা ও শাসনব্যবস্থার প্রতিই তাঁদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা মাঝে-মধ্যে স্থল ও নৌ-অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এখানে তাঁদের কয়েকটি নৌ-অভিযান বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো।

আব্বাসীয় আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হচ্ছে 'সাকালিয়া' বিজয়।

মামুনের রাজত্বকালে মুসলিম নৌবাহিনী 'সাকালিয়া' আক্রমণ করেন। 'সাকালিয়া' ইতিপূর্বে মুসলমানদের অধিকারে ছিলো। কিন্তু রোমকরা হামলা করে সেটি পুনরুদ্ধার করে। তখন 'সাকালিয়ার' শাসনকর্তা ছিলেন কনস্টান্টাইন। 'সাকালিয়ার' নৌ-অধিনায়ক ছিলেন ফেমী। ফেমী মুসলিম নৌবহরের ওপর কয়েকবার হামলা চালান। একবার রোম সম্রাট সেনানায়ক ফেমীর ওপর ভীষণভাবে রুষ্ট হন এবং তাঁকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দিতে 'সাকালিয়ার' গভর্নরকে নির্দেশ দেন।

এতে ফেমীর বন্ধু-বান্ধব ও অনুরক্তরা দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে গভর্নরের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। ফেমী আফ্রিকা থেকে সাকালিয়া পৌঁছে রাজধানী 'সারকাওসা' করায়ত্ত করেন।

সাকালিয়ার গভর্নর তাঁকে অপসারণ করার ফন্দি আঁটেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে গ্রেফতার ও নিহত হন। ফেমী সাকালিয়ার স্বাধীন সম্রাট ঘোষিত হন।

এই সময় আমীর যিয়াদাতুল্লাহ মুসলিম নৌযুদ্ধে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আমীর যিয়াদাতুল্লাহ আফ্রিকার শাসকর্তা ছিলেন। আফ্রিকা থেকে তিনি আসাদ ইব্ন ফুরাতের নেতৃত্বে তিনশ' বারো হিজরীতে সাকালিয়ায় অভিযান চালান। ফেমীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলমানরা কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। রোমকরা প্রতারণার আশ্রয় নিলে মুসলমানরা তা দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেন।

মুসলিম নৌবহর 'সারকাওসা' অবরোধ করে অল্পদিনের মধ্যেই তার পতন ঘটায়। 'সারকাওসা' বিজয়ের পর তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ অধিকার করে। এইভাবে স্বল্পকালের মধ্যেই গোটা 'সাকালিয়া'র ওপর মুসলিম প্রভুত্ব কায়েম হয়। ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌবহরের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

'সাকালিয়া' বিজয়ের পর মুসলিম নৌবাহিনী অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার করেন।

দু'শ' আটাশ হিজরীতে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র আমলে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। রণপোত কারখানা স্থাপন করা হয়। 'সাকালিয়া'র প্রসিদ্ধ নৌবন্দর মেসিনীরও মানোন্নীত হয়। এখান থেকে ভূমধ্যসাগরের নৌপথসমূহ পর্যবেক্ষণ করা যেতো।

দু'শ' উনচল্লিশ হিজরীতে তিনজন রোমান সেনানায়ক তিনশ' রণতরী-যোগে মিসর আক্রমণ করেন। তাঁরা মিসরের দামিয়াত বন্দরে লঙ্গর ফেলেন।

ঘটনাক্রমে মুসলিম নৌবহরের সমুদয় নাবিক তখন ঈদ-উৎসব পালন উপলক্ষে মিসরের অভ্যন্তরভাগে জামা'আতবদ্ধ হয়েছিলেন। দামিয়াত বন্দর বিল্‌কুল ফাঁকা পড়েছিলো। রোমকরা নির্বিবাদে নগরবাসীদের নিধন করে ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করে।

জনৈক মুসলিম সেনানায়ক—যিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন—এই দৃশ্য অবলোকন করে স্বীয় পদবেড়ী ভেঙ্গে ফেলেন এবং মুসলমানদের জমা করে রোমানদের ওপর এমন জোরে হামলা করলেন যে, ঊর্ধশ্বাসে পলায়ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর রইলো না। এই ঘটনার পর দামিয়াতের নৌ-ছাউনি আরো মজবুত করা হয়। উপকূলে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। নৌবহর আরো বাড়ানো হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সাকালিয়ার দ্বীপসমূহ ও তাঁর বিখ্যাত নৌবন্দর 'সারকাওসা' দীর্ঘদিন ধরে রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কখনো মুসলমানরা সাকালিয়া ও তার নৌবন্দরটি দখল করতেন, আবার কখনো রোমকরা।

দু'শ' চৌষট্টি হিজরীতে মুসলমানদের আমীর সাকালিয়ার জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ সাগর ও ভূমি উভয় দিক দিয়ে সারকাওসা আক্রমণ করেন। রোমকরা তাদের গোটা নৌবাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলায় নিয়োগ করেও ব্যর্থকাম হয়। আরেক বারের মতো

সাকালিয়ার ওপর মুসলিম আধিপত্য কায়েম হয়। মুসলিম নৌবহর কর্তৃক রোমান নৌবহর পরাভূত ও অধিকৃত হয়।

খলীফা মু'তাযিদের শাসনামলে দু'শ' সাতাশি হিজরীতে মুসলমানরা 'তারতূসের' বিখ্যাত নৌবন্দর দিয়ে রোমকদের আক্রমণ করেন। রোমকদের ত্রিশটি রণতরী ধৃত ও প্রজ্বলিত হয়। ত্রিশ হাজার নৌসেনা নিহত হয়।

রোমকরা তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তারতূসের নৌবন্দর আক্রমণ করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলো। কিন্তু তারতূসের শাসনকর্তা আবূ ছাবিত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদের পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন।

আব্বাসীয়গণ তাঁদের গৌরব যুগে মুসলিম নৌবহরের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালান এবং অবিরাম রোমান নৌবহরের সাথে সাগরবক্ষে যুদ্ধরত থাকেন। কিন্তু যখন আব্বাসীয়দের শক্তি হ্রাস পেতে লাগলো, তখন তুর্কী ও বিভিন্ন সেনানায়ক সবল হয়ে উঠলো। আব্বাসীয়দের সুবিশাল সাম্রাজ্য সেনানায়কদের মধ্যে বন্টিত হলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কায়েম হলো। মুসলিম নৌবহরও বিলীন হতে লাগলো। অবশ্য কতিপয় নতুন খানদান মুসলিম নৌশক্তিকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়াস পান। পরবর্তী স্ব স্ব স্থানে সেগুলো আলোচিত হবে।

এগারো

আগলাবী আমলে মুসলিম নৌবহর

আগলাবিগণ তাঁদের শাসনামলে অনন্য নৌশক্তির অধিকারী ছিলেন। ভূমধ্যসাগরের নৌবন্দর ও নৌছাউনিসমূহ তাঁদের করতলগত ছিলো। ভূমধ্যসাগরের সমুদয় দ্বীপদেশও ছিলো তাঁদেরই অধিকারভুক্ত।

— জনৈক ঐতিহাসিক

আগলাবিগণ মাত্র একশ' এগারো বছর মাস কয়েক আফ্রিকা ও সাকালিয়া শাসন করেন। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁরা বিরাট বিরাট কীর্তি স্থাপন করেন।

আগলাবী বংশ উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলভাগ শাসন করছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিলো আফ্রিকার বিখ্যাত কায়রোয়ান নগরী, উত্তর আফ্রিকা ও সাকালিয়ার মধ্যবর্তী দ্বীপগুলো মুসলমানদের অধিকারভুক্ত থাকায় আগলাবিগণ অনন্য নৌশক্তি অর্জন করেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন দুর্জয় নৌবহর।

ভূমধ্যসাগরের নৌবন্দর ও নৌছাউনিসমূহ আগলাবীদের দখলে ছিলো। সবগুলো দ্বীপাঞ্চল তাদেরই অধিকারভুক্ত ছিলো।

সাকালিয়ায় মুসলিম নৌ-অভিযান আমীর মু'আবিয়ার আমলেই শুরু হয়েছিলো। কিন্তু রোমকদের প্রতিহত করে এই দ্বীপদেশে মুসলমানদের পূর্ণ ও স্থায়ী আধিপত্য কায়েমের প্রচেষ্টা শুরু হয় আগলাবী আমলে।

আগলাবিগণ সাকালিয়ায় অধিকার কায়েম রাখার নিমিত্ত ভূমধ্যসাগরীয় অধিকাংশ দ্বীপভূমি করগত করেছিলেন। সাকালিয়া ও ইটালীর মধ্যবর্তী দ্বীপগুলোসহ মাসীনা সাগরেও আগলাবীদের শাসন কায়েম ছিলো। তাদের দুর্ধর্ষ নাবিকরা ইটালীর উপকূলীয় বন্দরসমূহ দখল করে ইটালীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। শুধু ইটালীই নয়, বরং ফ্রান্সের উপকূলেও তাঁরা উপনীত হন। আগলাবীদের এই সফলতার মূলে ছিলো তাঁদের অনন্য ও অকুতোভয় নৌশক্তি।

অবশেষে ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টান দেশ এবং বিশেষ করে রোমকরা আগলাবীদের নৌ-আধিপত্য মেনে নেয়।

আর এ কারণেই উত্তর আফ্রিকা ও সাকালিয়ার মধ্যবর্তী দ্বীপসমূহে মুসলিম আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। ইটালীর উপকূলীয় শহর ও রাজ্যসমূহও মুসলিম অধিকারে আসলো। ইটালীর মাসীনা প্রণালী থেকে শুরু করে আল্‌প্স পর্বত পর্যন্ত মুসলমানরা বুক ফুলিয়ে যাতায়াত করতেন। কোনো শক্তিই তাদের গতিরোধ করতে

পারতো না। মোটকথা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে আগলাবিগণ ভূমধ্যসাগরে যে পরিমাণ বিজয় লাভ করেছিলেন, তা আফ্রিকীয় ও স্পেনীয় অন্য আরবদের তুলনায় বিপুলাংশে বেশি।

আগেই বলা হয়েছে, আগলাবীদের পুরো রাজত্বকাল ছিলো একশ' এগারো বছর মাস কয়েক মাত্র। তাঁরা তাঁদের এই গোটা রাজত্বকালব্যাপী সকল সাধ্য-সাধনা ব্যয় করেন মুসলিম নৌশক্তি সংগঠনে। তাঁরা বহু নৌঘাঁটি ও বড় বড় নৌ-কারখানা স্থাপন করেন।

আগলাবী আমলে বহু বড় বড় নৌসেনাপতির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এখানে আমরা মাত্র একজন নৌসেনাপতির অবস্থা বিবৃত করবো। তাঁর নাম আবুল আগলাব। তোমরা আবুল আগলাবের জীবন থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করবে যে, সাগর-তরঙ্গের সাথে কোলাকুলির মধ্যেই জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নতি নিহিত। যেসব জাতি সমুদ্রের ভয়ঙ্কর পৃষ্ঠদেশকে নিজেদের ওড়না-বিছানা বানিয়েছেন, তাঁরাই দুনিয়ায় ইয্যত ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

বারো

সাকালিয়া বিজয়ী আবুল আগলাব

আবুল আগলাবের বীরত্ব, বীর্যবত্তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়চিত্ততা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মুসলিম নৌবহর সংগঠন ও প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে।

— জনৈক ঐতিহাসিক

আফ্রিকায় বনু আগলাব নামে এক প্রখ্যাতনামা রাজবংশ ছিলো। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইব্রাহীমুল আগলাব। বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের দরুন এই রাজবংশ ইসলামী ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

আবুল আগলাব এই বংশেরই এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আফ্রিকীয় সরকার কর্তৃক আমীরুল বহর (অ্যাডমিরাল) ও গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সাকালিয়া অভিমুখে গমন করছিলেন। পথিমধ্যে দৈবাৎ তাঁর জাহাজখানি উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। অগত্যা তিনি যানান্তরে আরোহণ করেন।

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পরই তাঁর নৌযানটি রোমীয় নৌদস্যুর কবলে পড়ে। নৌদস্যুরা তাঁর নৌযানে অগ্নিসংযোগ করতে চাইলে তিনি নৈপুণ্যের সাথে তা প্রতিহত করেন। রোমীয় নৌদস্যুরা কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো। আবুল আগলাবের নৌবহর সগৌরবে বলরাম পৌঁছে।

আবুল আগলাব অতি বুদ্ধিমান, সুচতুর ও দুঃসাহসী নৌযোদ্ধা ছিলেন। তিনি সাকালিয়ার শাসনদণ্ড সংহত করেই নৌশক্তির প্রতি মনোনিবেশ করেন। কারণ, তিনি আগমন-পথেই রোমান নৌশক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন। তাই সর্বাগ্রে নৌ-ডিপার্টমেন্টের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

আবুল আগলাব ভূমধ্যসাগরের সবগুলো দ্বীপ দখল করে মুসলিম শাসনভুক্ত করার সঙ্কল্প করলেন এবং তাঁর আশু ব্যবস্থা হিসাবে আফ্রিকা ও সাকালিয়ার মধ্যবর্তী দ্বীপগুলোকে কব্‌যা করে আফ্রিকা সাকালিয়ার যোগাযোগ পথটি নিষ্কণ্টক করতে চাইলেন। যাতে উভয় দেশের যোগাযোগ যথারীতি চালু ও সুগম থাকে।

আবুল আগলাব সর্বপ্রথম এক বিশাল নৌবহর তৈয়ার করে রোমান নৌবহরের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। কেননা, ইতিপূর্বে ওই রোমীয় নৌবহর কয়েক দফা হামলা চালিয়ে মুসলিম নৌ-বহরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিলো।

আবুল আগলাব স্বয়ং মুসলিম নৌবহরকে কমাণ্ড দেন। মুসলিম নৌবহর সুদৃঢ়, সুগঠিত সমরোপকরণে সুসজ্জিত ছিলো। মুসলিম নৌবহর রোমান নৌবহরের ওপর

অনলবর্ষণ শুরু করে। রোমান নৌবহর প্রতিরোধ শক্তি রহিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে মুসলিম নৌবহর স্বীয় স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে।

অতঃপর আবুল আগলাব স্বীয় পরিকল্পনা অনুসারে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোর প্রতি মনোযোগ দেন। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রথম দ্বীপটি ছিলো কাওসারা। এটি আফ্রিকা ও সাকালিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। মুসলিম নৌবহর এটি পদানত করে। আরেকবার রোমান নৌবহর মুসলিম নৌবহরের মুখোমুখি হলে মুসলিম নৌবহর আচমকা হামলা চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করলো। রোমান নৌবহর মুসলিম দখলে আসলো।

কাওসারা বিজয়ের পর আবুল আগলাব আরো কয়েকটি দ্বীপাঞ্চল দখল করলেন। মুসলিম নৌবহর তার ঝান্ডা উড়াতে উড়াতে ভূমধ্যসাগরে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিলো আর রোমান নৌবহর তীরে তীরে লুকিয়ে ফিরছিলো।

এবার আবুল আগলাব সাকালিয়ার অভ্যন্তর জয়ে মনঃসংযোগ করেন। গোটা সাকালিয়া ও সাকালিয়ার সমুদয় নৌবন্দর মুসলমানদের করতলগত হলো। ভূমধ্যসাগর সম্পূর্ণ রোমান নৌমুক্ত হলো। তাদের সাধারণ নৌযানগুলোও মুসলমানরা পাকড়াও করলেন।

আবুল আগলাব এই নৌ-অভিযান ব্যতীত সাকালিয়ার অভ্যন্তরভাগেও সৈন্য চালনা শুরু করেন। দু'শ' একুশ হিজরীতে ইটনার আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত মুসলিম সেনাদল গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করলেন। অতঃপর কাসরিয়ানা অভিযানে রওয়ানা হন। সগৌরবে কাসরিয়ানাও হস্তগত করলেন।

কাসরিয়ানা বিজয়ের পর জাফলুযী অবরোধ শুরু হয়। জাফলুযী ছিলো সাকালিয়ার এক উপকূলীয় শহর। মুসলিম বাহিনী উভয় দিক থেকে অর্থাৎ স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী একসাথে হামলা করেন। রোমান সরকার কনস্টান্টিনোপল থেকে এক বিরাট নৌবহরের মদদ তলব করে। উভয়পক্ষে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ইত্যবসরে আফ্রিকার স্বনামধন্য অধিনায়ক যিয়াদাতুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুধু আফ্রিকাই নয়, সাকালিয়ার মুসলমানদের ওপরও বজ্রপাত ঘটায়। মুসলিম সেনাদলে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

যিয়াদাতুল্লাহ একুশ বছর সাত মাস রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম। তিনি আফ্রিকার শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে সাকালিয়া বিজয়ে আত্মনিয়োগ করেন।

যিয়াদাতুল্লাহ্‌র পর তদীয় ভ্রাতা আবূ আক্কাল আগলাব আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শুরুতে আবূ আক্কালকে রাজ্যময় বিদ্রোহ ও গোলযোগের সম্মুখীন হতে হয়। আফ্রিকা ও সাকালিয়া দু'জাগার অবস্থাই সঙ্গীন হয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু আবূ আক্কাল অতি দ্রুত আফ্রিকার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনেন। অতঃপর দু'শ' চব্বিশ হিজরীতে এক বিরাট সৈন্যদল সাকালিয়ায় প্রেরণ করেন। সৈন্য পাঠানোর খবর পাওয়া মাত্রই সমগ্র সাকালিয়া শান্ত হয়ে যায়। সাকালিয়ার দুর্গে দুর্গে ইসলামী নিশান উড়তে থাকে।

আবুল আগলাব পুনরায় গোটা সাকালিয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করলেন। এবার তিনি সাকালিয়ার বাইরের দিকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার শুরু করেন। দক্ষিণ ইটালীর কোনো এক রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো। তিনি নেপল্‌স্ সরকারের সাহায্যার্থ স্বীয় নৌবহরও প্রেরণ করেন। তাঁরা বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে নেপল্‌স্‌কে সাহায্য করেন।

এরপর আবুল আগলাব সাকালিয়ার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনকার্যে অভিনিবেশ করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সাকালিয়া বিপুল উন্নতি লাভ করে।

দু'বছর সাত মাস রাজত্ব করার পর আবূ আক্কাল ইন্তিকাল করেন। তদস্থলে মুহাম্মদ ইব্‌ন আগলাব আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিও আবুল আগলাবকে সাকালিয়ার গভর্নর ও আমীরুল বহর পদে বহাল রাখেন।

আবুল আগলাব সাকালিয়াকে দৃঢ়ভাবে কব্‌যা করলেন। সাকালিয়ার তীরবর্তী শহরে নানাবিধ নৌ-ছাউনি স্থাপন করেন। নৌবহরকে আরো শক্তসমর্থ করেন। দু'শ' ছত্রিশ হিজরীতে আবুল আগলাব ওফাত পান। আবুল আগলাব সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠতম নৌ-অধ্যক্ষ ছিলেন। সুদীর্ঘ ষোড়শ বছরকাল তিনি সগৌরবে সাকালিয়া শাসন করেন।

আবুল আগলাবের শাসনকাল সাকালিয়ার সর্বোত্তম কাল বলে সুবিদিত। তাঁর সংগঠিত নৌবাহিনী ও শাসনব্যবস্থা সর্বদা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর ছিলো।

আবুল আগলাবের বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, উচ্চাভিলাষ ও দৃঢ়তা সত্যই অনুকরণযোগ্য। মুসলিম নৌবাহিনী সংগঠন তাঁর প্রতিটি লম্‌হা ব্যয়িত।

তেরো

আমীরুল বহর উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্‌দী

উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্‌দী ফাতিমী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফাতিমী বংশের অমিতসাহসী ও পরাক্রমশালী আমীরুল বহর ছিলেন। তিনি তাঁর নৌবহর দ্বারা ভূমধ্যসাগরকে করতলগত করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরের আফ্রিকীয় ও ইউরোপীয় উপকূল ছিলো তাঁর নৌ-চারণক্ষেত্র।

— জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক

আগলাবীদের পর উত্তর আফ্রিকা ও সাকালিয়ার শাসনদণ্ড ফাতিমীদের হস্তগত হয়। ফাতিমীদের বিরুদ্ধে সাকালিয়ায় কয়েক দফা বিদ্রোহ ও শোরহাঙ্গামা হলেও শেষ পর্যন্ত ফাতিমীদেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফাতিমীদের আমীরুল বহরগণ তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতা ও অত্যুজ্জ্বল কীর্তিকাণ্ডের দরুন মুসলিম ইতিহাসে সুবিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁদের সবার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা এই স্বল্পায়ত পুস্তকে সম্ভবপর নয়। তোমরা বড় হয়ে বড় বড় গ্রন্থ পড়ে তা জানতে পারবে। আমরা এখানে শুধু ফাতিমীয় মশ্‌হুর আমীরুল বহর সালিম ইব্‌ন আবী রাশিদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করবো।

সালিম ইব্‌ন আবী রাশিদ ফাতিমী তিনশ' পাঁচ হিজরীতে সাকালিয়ার গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সাকালিয়ায় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। সাকালিয়ায় শাসন-শৃংখলা কায়েম করতে তাঁর আটটি বছর অতিবাহিত হয়। এরপর তিনি সাকালিয়ার পোতাশ্রয় ও জাহাজ নির্মাণ কারখানাসমূহ বিন্যস্ত করেন।

এবার তিনি ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ করতলগত করেন এবং এই ব্যাপদেশে তাঁকে রোমক ও গ্রীক নৌবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়।

তিনশ' দশ হিজরীতে ফাতিমিগণ ইটালীর উপকূল অঞ্চলসমূহে নবরূপে নৌহামলা চালান। এই নৌহামলার সূত্রপাত হয় উত্তর আফ্রিকা থেকে। অভিযানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সাকালিয়ার গভর্নর সালিম ইব্‌ন আবী রাশিদ।

অভিযান পরিচালনা করেন কাওয়ারিব নামক জনৈক কুশলী নৌসেনানী। এঁরা ইটালীর উপকূলভাগে পুনরায় মুসলিম বিজয় নিশান উত্তোলন করেন। ইটালীর বেশ ক'টি বৃহৎ অঞ্চল পদানত হয়।

পরবর্তী বছর মাস'উদ নামক জনৈক নৌসেনাপতির অধীনে ইটালীতে এক বিরাট নৌবহর প্রেরিত হয়। এই নৌবহরের কুড়িটি রণপোত ছিল। ইটালীর বিখ্যাত আগাছি শহর আক্রমণ করে মাস'উদ বিরাট নৌবিজয় অর্জন করেন।

এই সফল অভিযানের পর মাস'উদ তাঁর নৌবহরসহ উত্তর আফ্রিকার মাহ্‌দীয়ায় গমন করেন।

মাস'উদের এই নিদারুণ সফলতায় ইটালীতে ফাতিমী রাজত্বের এক শানদার ভবিষ্যৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সাকালিয়ার তরফ থেকে এক যবরদস্ত নৌবহর তৈয়ার করা হয়। দু'জন খ্যাতনামা আমীরুল বহরের হাতে এই নৌবহরের নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিলো। তাঁদের একজন ছিলেন আমীর সালিম এবং অপরজন আমীর জা'ফর।

ইটালীর সাগর তীরে নেমে তাঁরা দু'জনেই বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্য চালনা শুরু করেন। ইটালীর মশ্‌হুর বারীসানা শহর দখল করে তার সর্বত্র ইসলামী নিশান উড়িয়ে দেন।

আমীর জা'ফর তাঁর বাহিনী দ্বারা ইটালীর ওয়ারী নগর দখল করেন। ওয়ারীর গভর্নর ও কয়েকজন বড় ফৌজী অফিসার গ্রেফতার হন। ফাতিমী নৌসেনারা ইটালীর ওয়ারী নগর থেকে বিপুল পরিমাণ 'মালে গনীমত' লাভ করেন।

এই ফৌজী সাফল্য ফাতিমী নৌবহরে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। তিনশ' পনেরো হিজরীতে সারিব নামক নৌসেনাপতির নেতৃত্বে এক নৌঅভিযানের প্রস্তুতি চলে। তিনি চুয়াল্লিশটি রণপোত দ্বারা দক্ষিণ ইটালীর বিখ্যাত শহর ও বন্দর টরেন্টো আক্রমণ করে পদানত করেন। এই সাফল্যের পর সারিব তাঁর নৌবহরসহ সাকালিয়া ফিরে আসেন।

পর বছর তিনি সাকালিয়া থেকে নতুনভাবে নৌঅভিযান শুরু করেন। ইটালীর উপকূল থেকে রোমক ও গ্রীক নৌবহর গ্রেফতার করে সাকালিয়ায় নিয়ে আসেন। কিছুদিন বিশ্রাম করার পর পুনরায় তিনি ইটালী আক্রমণ করে এক নতুন শহর অধিকার করেন।

তিনশ' সতেরো হিজরীতে সারিব রোমকদের সাথে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সারিবের হাতে ছিলো মাত্র চারটি রণতরী। আর রোমান পক্ষে ছিলো তার দ্বিগুণ নৌসেনা। উভয় দলই প্রতিপক্ষের রণতরী ঘায়েল করার প্রাণান্ত প্রয়াস চালায়। কিন্তু বিজয় ও সাফল্য ছিলো সারিবের ললাট-লিখন। তাই সাফল্যের জয়মাল্য সারিবেরই কণ্ঠলগ্ন হলো।

এই বিজয়ের পর সারিব ইটালীস্থ তারমূলা নগরে উপনীত হন। তারমূলা নগর ইটালীর পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। সারিব এই বিখ্যাত শহরটি অধিকার করে প্রচুর মালে গনীমতসহ সাকালিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

দুঃসাহসী ফাতিমী জওয়ানরা তিনশ' দশ হিজরী থেকে তিনশ' সতেরো হিজরী পর্যন্ত উপর্যুপরি নৌ-হামলা চালিয়ে ইটালীতে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করলেন। ফলে ইটালী সরকার কর প্রদানে সম্মত হয়ে ফাতিমীদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী ইটালী ত্যাগ করেন আর ইটালী সরকার যথারীতি আফ্রিকায় কর পাঠাতে থাকেন।

ইটালীর সাথে সন্ধি হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দী ফ্রান্স ও ইটালীর সীমান্ত শহর জেনোয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনশ' বাইশ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দী প্রখ্যাত নৌসেনানায়ক ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাকের নেতৃত্বে এক প্রবল নৌবহর প্রেরণ করেন। নৌবহরটি জেনোয়ার সুদৃঢ় নৌ-রক্ষাব্যবস্থা দেখে ওয়াপস চলে আসে।

ইউরোপে মুসলিম বিজয়স্রোত জেনোয়ার প্রাচীরগাত্র স্পর্শ করতেই উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দী তাঁর আরব্ধ কার্যক্রম ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর ন্যস্ত করে তিনশ' বাইশ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দী ফাতিমী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফাতিমী বংশের একজন অমিততেজা পরাক্রান্ত আমীরুল বহর ছিলেন। তিনি তাঁর নৌবহরের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরকে কব্‌যাভুক্ত করেছিলেন। আফ্রিকীয় ও ইউরোপীয় উপকূল ছিলো তাঁর নৌ-ক্রীড়াকেন্দ্র।

উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দী কেবল একজন নৌ-সেনাধ্যক্ষই ছিলেন না, রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্যক ওয়াকিফহাল। তিনি তাঁর বাহুবল ও বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র চব্বিশ বছর দশ মাসের মধ্যেই আফ্রিকা, ত্রিপোলী, বারকা ও সাকালিয়া জয় করেন। অতঃপর স্বীয় নৌ-দক্ষতা বলে ইটালীকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারেও বাধ্য করেন।

ইটালীর পর তিনি ফ্রান্সের দিকে তাকান। কিন্তু পরপারের ডাক তাঁর সে আশা পূরণ হতে দেয়নি।

উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্দীর নৌ-ক্রিয়াকাণ্ড ও বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলী থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সাথে সাথে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার ইয্‌যত কেবল সেইসব জাতিরই প্রাপ্য, যাঁরা আল্লাহ্‌র নিয়মতরাজির কদর করতে জানেন এবং যাঁরা পানিতে ও ডাঙ্গায় স্বীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্মান লাভে সচেষ্ট হন।

চৌদ্দ

উছমানীয় রাজত্বে মুসলিম নৌবহর

উছমানীয় রাজত্বে আমীরুল বহর পদের নাম ছিলো কাপুদান পাশা। সাম্রাজ্যের সকল নৌবহর তথা গোটা সামুদ্রিক কার্যক্রমই ছিলো তাঁর তত্ত্বাবধানাধীন। কনস্টান্টিনোপল ছিলো তাঁর সদর দফতর।

— জনৈক ঐতিহাসিক

যেসব ইউরোপীয় জাতি প্রাচ্যের সাথে সওদাগরী ও নৌ-সম্পর্ক স্থাপন করেন, ভেনিস ও জেনোয়াবাসীরা ছিলেন তাদের পুরোভাগে। এই দুটি দেশের দূরন্ত ও সাহসী নাবিকরাই ইউরোপীয়দেরকে জাহাজ চালনা ও জাহাজ নির্মাণ শিক্ষা দেন।

জেনোয়া ও ভেনিসবাসীদের সাথে তুর্কীদের সম্পর্ক ছিলো খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ। তাই ইউরোপীয় নৃপতিরা উছমানীয় রাজ্য আক্রমণ করলে জেনোয়া ও ভেনিসের রণতরীর সাহায্যে তা প্রতিহত করা হতো।

কনস্টান্‌টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ্‌-এর আমল পর্যন্ত উছমানীয় সালতানাতের যে ক'জন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, তাঁরা সকলেই প্রয়োজনকালে ভেনিস ও জেনোয়ার নৌবহরগুলো কাজে লাগাতেন। কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ্‌ (বিজয়ী) অনুভব করলেন, কনস্টান্‌টিনোপল বিজয়ের জন্য তুর্কীদের একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নৌবহর থাকা আবশ্যক এবং এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই তিনি উছমানীয় নৌবহরের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মুহাম্মদ ফাতিহ্‌ কনস্টান্‌টিনোপল অবরোধের সময় পাঁচ মাইল ভূমির ওপর দিয়ে জাহাজ চালিয়েছিলেন। সে কীর্তিকথা তোমরা মুহাম্মদ ফাতিহ্‌-এর নৌ-সেনাপত্যের আলোচনায় অবগত হতে পারবে। আহা! তোমাদের মধ্যেও যদি এমন কোনো নৌ-সেনাপতি বা নাবিকের জন্ম হতো!

কনস্টান্‌টিনোপল বিজয়ের পর মুহাম্মদ ফাতিহ্‌ তার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত তুর্কী নৌবাহিনীকে আরো উন্নত ও পুনর্গঠিত করা আবশ্যক মনে করেন। তাই ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রশিক্ষণ দান করে তুর্কী নৌবহরকে বলিষ্ঠতর করে তোলেন।

এরপর তিনি জেনোয়া জয়ের সঙ্কল্প করেন। চৌদ্দশ' পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দে এক সুবর্ণ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। ক্রীমীয়ার খানদের মধ্যে বহুদিন থেকেই গৃহযুদ্ধ চলে আসছিলো। জনৈক খান একদিকে এবং অন্যরা অপর জেনোয়াবাসীর স্বপক্ষে। জেনোয়া ক্রীমীয়ার ইয়াফা শহর দখল করে নিয়েছিলো। তাই অপর দল উছমানীয়দের সাহায্যপ্রার্থী হলো।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ্ কাপ্তান আহমদের সৈনাপত্যে এক বিরাট নৌবহর পাঠিয়ে ইয়াফা দখল করলেন। তিনি গ্রীক উপকূলীয় বন্দরগুলোও করায়ত্ত করলেন।

মুহাম্মদ ফাতিহ্ তুর্কী নৌবহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি যখন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন, তখন তাঁর সাথে ত্রিশটি রণপোতবিশিষ্ট এক নৌবহরও ছিলো। এই নৌবহরটি গোল্ডেন হর্নে তুর্কী আমীরুল বহর বোল্ তুগলীর নৌসেনাপত্যে এক অসাধারণ কৃতিত্ব সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেছিলো।

কনস্টান্টিনোপল জয় করার পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ্ তারাবিয়ূন, সানিউপ, কাফা, ইয়াফ প্রভৃতি নামকরা কূলভূমিগুলো পদানত করেন। মারমোরা সাগর ও কৃষ্ণসাগরও তুর্কী অধিকারে আসে।

মোট কথা, তুর্কী নৌবাহিনী তখন উন্নতির উচ্চমার্গে আরোহণ করেছিলো। ভূমধ্যসাগর, মারমোরা সাগর ও কৃষ্ণসাগরে তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই অবশিষ্ট ছিলো না। বিশেষ করে সুলায়মান-ই আ'জম কানুনীর সময় খায়রুদ্দীন পাশা উছমানীয় নৌবাহিনীকে দৃঢ়ভাবে সুসংহত করেন। খায়রুদ্দীন পাশা বারবারোসা ছিলেন দুনিয়ার একজন প্রথমসারির নৌসেনাধ্যক্ষ।

এখনো তুর্কীদের মধ্যে খায়রুদ্দীন বারবারোসার নাম নিতান্ত শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কারণ, তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে উছমানীয় নৌবহরকে সমুন্নতি দান করেছিলেন। ইউরোপীয় নৌবহরগুলো উছমানীয় নৌবহরের মুকাবিলায় অক্ষম ও অপারক হয়ে পড়েছিলো।

ইউরোপীয় খৃস্টান নৌবাহিনীর সম্মিলিত শক্তিও বারবারোসার নৌবহরকে ঠেকাতে পারতো না। খ্যাতনামা খৃস্টান নৌ-অধিনায়ক এনড্রিয়া ডোরীয়া খায়রুদ্দীন পাশার মুখোমুখি হতে রীতিমতো ভয় পেতো।

এখানে আমরা কয়েকজন তুর্কী আমীরুল বহরের নামোল্লেখ করছি। সামনে তাঁদের কিছু জীবনচিত্রও পেশ করবো। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মুহাম্মদ ফাতিহ্, খায়রুদ্দীন পাশা, তুরগুত পাশা, হাসান পাশা, পীরী রঈস পাশা, সাইয়িদী আলী ও সুলায়মান পাশা।

এখন এঁদের প্রত্যেকের কিছুটা কর্মকুশলতার আভাস দান করা হচ্ছে। এতে তোমরা উছমানীয় আমীরুল বহরদের ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। তাদের বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবে।

উছমানীয় রাজত্বে উছমানীয় আমীরুল বহরের খিতাব ছিলো কাপুদান পাশা। সাম্রাজ্যের সমুদয় নৌবহর তাঁর অধীন থাকতো। কনস্টান্টিনোপল ছিলো তাঁর সদর

দফতর। উছমানীয় নৌবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও নাবিকরা ছিলো খৃষ্টান নও-জওয়ান। এরা সকলেই ছিলো সুলতানের দাসানুদাস।

ইসলামী শিক্ষা ও সাহচর্য তাদের এমনভাবে গড়ে তুলেছিলো যে, ষোড়শ শতকের গোটা ইউরোপবাসীই এদের প্রবল প্রতাপে তটস্থ হয়ে থাকতো। আমীরুল বহরদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের গুণ-গরিমা ও সুখ্যাতি কেবল ইসলামী ইতিহাসই নয়, ইউরোপীয় নৌ-ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উছমানীয় কাপুদান পাশারা বিরাট বিরাট বিজয়াভিযান দ্বারা উছমানীয় সাম্রাজ্যের অনেক বিস্তৃতি ঘটান। নৌ-বিজয় ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতেও তাঁরা বহু কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

পীরী রঈস ভূমধ্যসাগর ও ঈজীয়ান সাগরের একটি মানচিত্র তৈয়ার করেন। তাতে স্রোতের গতিবেগ, বিভিন্ন স্থানের গভীরতা ও নৌ-বন্দরসমূহের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাতব্য লিপিবদ্ধ ছিলো।

অনুরূপভাবে সাইয়িদী আলী যাঁর জাহাজ প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ভারতের উপকূলে এসে ঠেকেছিলো—খোরাসন, বেলুচিস্তান ও ইরান হয়ে স্থলপথে তুরস্ক পৌছেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিখে জাতিকে অনেক মূল্যবান তথ্য উপহার দিয়েছেন। এছাড়া তিনি ভারত মহাসাগরের ওপর 'মুহীত' (বেষ্টনকারী) নামক একখানি তথ্যবহুল গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ষোড়শ শতকের শেষপাদে উছমানীয় নৌবাহিনীতে ধস নামতে শুরু করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে এই বাহিনী দুর্বলতর হয়ে পড়ে।

এর মূলীভূত কারণ ছিলো রাষ্ট্রীয় ভ্রান্তনীতি ও তার বুনিয়াদী গলদ। উছমানীয় নৌবাহিনীর চাকরি ছিলো খৃষ্টান যুবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার পরিণাম ফল যতখানি খারাপ হওয়ার ততখানিই হয়েছে।

তিনশ' বছর পর সুলতান আবদুল আযীয খান তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচি ও উৎসাহবশত মুসলিম নৌবাহিনী পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি মুসলিম নৌবহরকে ইউরোপীয় সেরা নৌবহরের সমপর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান আবদুল হামীদ খানের সময় ওইসব রণতরীর গোল্ডেন হর্ন থেকে বের হওয়ারও সুযোগ ঘটেনি। সেখানে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সেগুলোতে মরচে পড়তে থাকে।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মদ ফাতিহ্

মুহাম্মদ ফাতিহ্ কনস্টান্টিনোপল অবরোধে এক অপূর্ব ও অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। বসফোরাস থেকে কনস্টান্টিনোপল বন্দর পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি কাঠের তখতা দিয়ে এই পাঁচ মাইলব্যাপী এক সড়ক নির্মাণ করেন। অতঃপর তার ওপর প্রচুর পরিমাণ চর্বি ঢেলে দেন। সড়কটি পিচ্ছিল হওয়ার পর এক নিঝুম রাতে তার ওপর দিয়ে আশিটি নৌযান টেনে নেয়া হয়। ফলে সহসাই কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে।

— জনৈক ঐতিহাসিক

মুহাম্মদ ফাতিহ্ ছিলেন সমকালীন প্রখ্যাত দিগ্বিজয়ী। তিনি কনস্টান্টিনোপলকে স্বীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ইতোপূর্বে রোমক শাসিত এশীয় অঞ্চলসমূহ তুর্কীদের করায়ত্ত হয়েছিলো। কেবল কনস্টান্টি-নোপলই তাঁদের অনধিকৃত ছিলো।

মুহাম্মদ ফাতিহ্ কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন। ওদিকে কনস্টান্টিনোপলের শাসনকর্তা সম্রাট কনস্টান্টাইনও প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্থলবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে তোমরা অন্যত্র জ্ঞাত হতে পারবে। এখানে আমরা মুহাম্মদ ফাতিহ্র নৌ-অভিযান সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে প্রথমেই নৌযুদ্ধ বেধে যায়। পাঁচটি রোমান জাহাজ কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রসদ বয়ে আনছিলো। মারমোরা সাগর অতিক্রম করে সেগুলো বসফোরাস প্রণালীতে প্রবেশ করতেই উছমানীয় নৌবহর পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

রসদবাহী জাহাজ বন্দরে ঢোকা মাত্রই তুর্কী নৌবহর তার ওপর হামলা চালায়। ওদিকে রোমান নৌবহরও প্রস্তর ও অনলবর্ষণ শুরু করে। তুর্কী নৌবহর ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ফলে রোমান জাহাজগুলো বন্দরে পৌঁছে যায়।

মুহাম্মদ ফাতিহ্ নৌযুদ্ধে তাঁর প্রথম পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, বসফোরাস প্রণালীর যে অংশে পানির গভীরতা বেশি, সে অংশে তুর্কী নৌবহরগুলো রোমক বাহিনীর মুকাবিলায় সফল হতে পারবে না। তাই তিনি তাঁর গরিষ্ঠসংখ্যক রণতরী বন্দরের অপরদিকে স্থানান্তর করার সঙ্কল্প করেন। সেদিকে পানির পরিমাণ ছিলো অপেক্ষাকৃত কম।

বস্তুত এ ছিলো এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য কৌশল। মুহাম্মদ ফাতিহ্র ইস্পাতকঠিন সঙ্কল্পের এক অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত। তিনি বসফোরাস ও কনস্টান্টিনোপল বন্দরের মধ্যে কাঠের তখ্তার এক সড়ক তৈয়ার করেন। অতঃপর তাতে বেশ করে চর্বি ঢালেন। সড়কটি তৈলাক্ত ও পিচ্ছিল হওয়ার পর এক নিঝুম রাতে তার ওপর দিয়ে আশিটি নৌ-জাহাজ টেনে নেয়া হয়। ফলে সহসাই কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর মুহাম্মদ ফাতিহ্ গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের প্রতি নজর দেন। অনেকগুলো দ্বীপদেশ গ্রীকদের অধীনে ছিলো। তিনি যুদ্ধ করে সেগুলো হস্তগত করেন। লেস্‌বস, লেম্‌নস, সেফালোনিয়া প্রভৃতি তাঁরই অধিকৃত কতিপয় বিশিষ্ট দ্বীপভূমি।

ভেনিস তার নৌশক্তির ওপর অত্যন্ত গর্বিত ছিলো। অপরদিকে বলকান রাজ্যসমূহের ওপর তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর এড্রিয়াটিক সাগর ও ঈজীয়ান সাগরে তাঁরা রণপোতসংখ্যা বাড়াতে লাগলেন।

মুহাম্মদ ফাতিহ্ তাঁর নৌবহরের সাহায্যে আলবানিয়া জয় করেন। এড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল অঞ্চলেও তুর্কী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কী ও ভেনিসের নৌযুদ্ধ ষোলো বছরকাল স্থায়ী হয়েছিলো।

ভেনিসের সমগ্র তীরভূমি তুর্কীদের অধিকারে আসে। ভেনিসের ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহও তাঁদের হস্তগত হয়।

ভেনিস একদল প্রতিরোধী ফৌজ গঠন করে। কিন্তু জনৈক তুর্কী আমীরুল বহর সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের চরমভাবে পরাস্ত করেন।

ভেনিসের নৌশক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার পরও ঈজীয়ান সাগরের রোডস দ্বীপটি তুর্কী নৌবহরের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই দ্বীপদেশ দেড়শ' বছর যাবৎ খৃস্টান শাসনে ছিলো। খৃস্টানরা সেখান থেকে সহজেই উছমানীয় নৌ-জাহাজে হামলা চালাতো।

মুহাম্মদ ফাতিহ্ রোড্স দ্বীপ অধিকার আবশ্যক মনে করলেন। তিনি চৌদ্দশ' আশি খৃস্টাব্দ মশ্‌হুর আমীরুল বহর মাসীহ্ পাশাকে এই অভিযানে প্রেরণ করেন। মাসীহ্ পাশা রোডস দ্বীপ অবরোধ করলেন।

অপরদিকে খৃস্টানরাও পূর্ণ প্রতিরোধে প্রস্তুত ছিলো। দীর্ঘকাল অবরোধের পর অবশেষে তুর্কীরা এক ব্যাপক আক্রমণ চালালেন। রোডস হারতে হারতে জিতে গেলো। তুর্কীদের এই ব্যর্থতা পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হয়।

রোডস দ্বীপে মাসীহ্ পাশা পরাস্ত হলেও ওদিকে আহমদ কেদক ইটালীর মূল ভূখণ্ডে পা রাখতে সক্ষম হন। ইতোপূর্বে কোনো তুর্কী সেনাই এখানে কদম রাখতে পারেন নি। তুর্কী বাহিনী ইটালীর প্রসিদ্ধ টরেন্টো বন্দর দখল করলেন।

এই বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ ফাতিহ্ তুর্কীদের জন্যে ইটালী জয়ের পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি গোটা ইটালী জয় করে রোমে হিলালী নিশান উড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে মৃত্যু এসে তাঁর এই হার-জিতের পাল্লাপাল্লি চিরতরে থামিয়ে দিলো।

ষোলো

আমীরুল বহর উরূজ বারবারোসা

ইসলামের বীর সন্তান উরূজ ছিলেন একজন দশাসই গাঁট্টা-গোঁট্টা সুপুরুষ। শ্মশ্রু ও শিরকেশ লোহিতবরণ। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও সন্ধানী চোখ দুটি তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের পরিচায়ক। নাসিকা উন্নত ও দীর্ঘকায়। গৌরবর্ণের নূরানী চেহারা।

— জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক

গ্রীক দ্বীপমালার একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম আইউবিয়া। সুলতান মুহাম্মদ ছানী (দ্বিতীয়) চৌদ্দশ' বাষট্টি খৃষ্টাব্দে এটি জয় করেন। অতঃপর তাঁর স্থানীয় প্রতিনিধি ইয়াকুবের নামে দ্বীপটি বন্দবস্ত দিয়ে তিনি কনস্টান্টিনোপল চলে আসেন।

তুর্কী ঐতিহাসিকগণ তাঁকে মুসলমান বলে বর্ণনা করেছেন আর খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ বলেছেন খৃস্টান। যা হোক, আইউবিয়া শাসন করতে করতেই ইয়াকুবের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র রেখে যান। ইস্‌হাক, ইলিয়াস, উরূজ ও খিয্‌র। ইস্‌হাক ছিলেন আইউবিয়ার একজন ধনাঢ্য সওদাগর। উরূজ ও খিয্‌র ছিলেন প্রথম থেকেই উদ্যমী ও সাহসী। তাই ইলিয়াস, উরূজ ও খিয্‌র নৌ-বাহিনীতে ভর্তি হন। ইলিয়াস প্রথমদিকেই এক নৌ-যুদ্ধে মারা যান। কিন্তু উরূজ ও খিয্‌রের (খায়রুদ্দীন) নৌকীর্তি আজো ইসলামী ইতিহাসে স্বমহিমায় ভাস্বর।

বারবারোসা বংশের লোকেরা নাবিকের কাজ কেনো বেছে নিয়েছিলেন ঐতিহাসিকগণ সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তার মোদ্দা কথা হলো, এই সময় দক্ষিণ ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরে নাবিকের কার্যেই যুবকরা বেশি উৎসাহ বোধ করতো। তাই বারবারোসা গোত্রের নও-জওয়ানরাও এই কাজকেই তাদের উপযুক্ত পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

উরূজ ও খায়রুদ্দীন পাশার প্রথম জীবনের কাহিনী ঐতিহাসিকরা সোৎসাহে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সারমর্ম হচ্ছে, শুরু থেকেই এই ভ্রাতৃযুগল দূরন্ত ও দুঃসাহসী ছিলেন।

সর্বপ্রথম এখানে আমি উরূজের কীর্তিকথা বয়ান করবো। উরূজ আপন বাহুবলে একটি ক্ষুদ্রকায় নৌবহর গড়ে তুললেন।

তিনি গ্রীক দ্বীপমালাকে স্বীয় দৌড়ঝাঁপের পক্ষে অপ্রতুল মনে করতেন। তাছাড়া, তুর্কী নৌবহরের ক্রমোন্নতির দরুন এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটিও ছিলো তাঁর নৌ-মহড়ার পক্ষে অনুপযোগী। তাই তাঁর জন্যে এক সুবিস্তৃত লীলাভূমির প্রয়োজন ছিলো।

এ হচ্ছে তখনকার কথা, যখন স্পেনের হাজার হাজার মজলুম মুসলমান স্পেন ত্যাগ করে আফ্রিকার তীরভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করছিলো আর খৃষ্টান লুটেরারা তাদের লুটমার করে খতম করে দিচ্ছিলো।

উরূজ তাঁর নৌবহরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার লক্ষ্যে ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার মুসলমানদের ত্রাণকার্যে নিয়োগ করেন।

পনেরোশ' চার খৃষ্টাব্দে সেনানায়ক উরূজ তাঁর ছোট্ট নৌবহরটি আফ্রিকার বারবার উপকূলের এক সুরক্ষিত বন্দরে লুকিয়ে রাখেন এবং যখন শত্রুসেনারা স্পেনের মজলুম মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতো, তখন তিনি অমিতবিক্রমে তার মুকাবিলা করতেন।

তিউনিস বন্দরটি প্রাকৃতিকভাবেই সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ছিলো। হাল্‌কুল ওয়াদ-এর ছোট্ট কিল্লাটি সেনানায়ক উরূজের ক্ষুদ্র নৌবাহিনীর কেন্দ্রস্বরূপ ছিলো। তাই সেনানায়ক উরূজ ওই দুর্গটিকেই তাঁর নৌকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি স্পেন বিতাড়িত মুসলমানদের এখানেই স্বাগত জানাতেন এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন।

উরূজ তিউনিস সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন এবং চাকরির দরখাস্ত করেন। সুলতান তাঁকে আমীরুল বহর নিযুক্ত করেন। তিনি নৌবন্দর ও নৌবহর গঠন করেন। ভূমধ্যসাগরে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেন। দক্ষিণ ইউরোপের খৃষ্টান বাহিনীর মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন।

সেনানায়ক উরূজ স্পেনের বিপন্ন মুসলমানদের স্পেন ত্যাগে সহায়তা করেন এবং এ ব্যাপারে খৃষ্টান নৌবাহিনীর সকল অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করেন।

রোমের খ্যাতনামা খৃষ্টান পোপের নৌবহরটি তখন পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করার দুঃসাহস করেনি। উরূজ সেটিও সুকৌশলে পাকড়াও করে তার সারেং-সুকানীদের কারারুদ্ধ করেন।

বারবারদের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু সেনানায়ক উরূজের লক্ষ্য ছিলো আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি পোপের সারেং সুকানী দ্বারা অনেক কাজ আদায় করেন। তাদের দ্বারাই তিনি স্বীয় নৌবহরটি সংগঠিত করেন।

নৌবাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর উরূজ স্পেন অভিযানের তোড়জোড় শুরু করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এক মস্ত নৌবাহিনী তৈয়ার হলো। বড় বড় বাহাদুর ও বাছা বাছা নওজওয়ান তাতে শরীক হলেন। তখনকার স্পেনীয় নৌশক্তি গোটা ইউরোপীয় নৌশক্তির চেয়েও অনেক শক্তিশালী ছিলো।

জিব্রাল্‌টারের অনতিদূরে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হলো। যুদ্ধের রায় উরূজের পক্ষেই ঘোষিত হলো। স্পেন পরাজয় বরণ করলো।

এই কামিয়াবী উরূজের আজমত এ শুহ্রাত শতগুণে বাড়িয়ে দিলো। এই সময় উরূজের নৌশক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিলো। আটশ' রণপোত সতত 'হাল্‌কুল ওয়দ' বন্দরে উরূজের হুকুমের অপেক্ষা করতো। এছাড়া, আরো কিছু যুদ্ধজাহাজ উরূজের দুই ভ্রাতার কর্তৃত্বাধীন জেরবা বন্দরে অবস্থান করতো। তারা খৃষ্টান নৌবহরের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতো।

উরূজের মতো একজন বাহাদুর ও বীর কেশরীর পক্ষে ক্ষুদ্র দ্বীপ জেরবার রাজত্বে সন্তুষ্ট থাকা শোভন ছিলো না। তাঁর প্রয়োজন ছিলো আরো আজমত ও শুহ্রাত অর্জন করা।

পনেরোশ' বারো খৃষ্টাব্দে এক নতুন সুযোগ উপস্থিত হয়। স্পেন বুজেয়া বন্দর দখল করে সেখানকার শাসনকর্তাকে মারপিট করে তাড়িয়ে দেয়। তিনি সকল দিক থেকে নিরাশ হয়ে উরূজের শরণাপন্ন হন। যুদ্ধে জয়লাভ করলে বুজেয়া বন্দরটি উরূজ ও তাঁর সহযোগীদের অবাধ ব্যবহারে ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

উরূজের পক্ষে স্পেন অভিযানের চেয়ে উত্তম সুযোগ আর ছিলো না এবং বুজেয়ার চেয়ে বড় কোনো স্থানও আর ছিলো না। সুতরাং নির্দ্বিধায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। এবার আমীরুল বহর তাঁর নৌ-অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করলেন। তিনি স্পেন অভিযান শুরু করলে হাজার হাজার মুসলমান এসে তাতে যোগ দিলেন।

উরূজ তাঁর নৌবহর সমভিব্যাহারে বুজেয়া বন্দরে পৌছলেন। দুই বাহিনী (বুজেয়ার সরকারী বাহিনী ও উরূজের নৌবাহিনী) সম্মিলিতভাবে স্পেন আক্রমণ করলেন। স্পেনীয় বাহিনী স্বল্পকাল মুকাবিলা করে একটি দুর্গে আশ্রয় নিলো। দশদিন অবরোধের পর দুর্গ-প্রাচীরে গোলা বর্ষিত হলো। কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হলো না।

এই অবরোধে আমীরুল বহর আহত হন এবং চিকিৎসার্থ তিউনিসে নীত হন। তাঁর নৌবাহিনীও অবরোধ তুলে আফ্রিকায় পৌছলেন। ওয়াপস্‌কালে জেনোয়ার একটি বাণিজ্যতরী পাকড়াও করে আনেন।

উরূজের অসুস্থ অবস্থায় খায়রুদ্দীন পাশা তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন। বাণিজ্যতরী 'ছিনতাই'র খবর পেয়ে ডোরীয়া তাঁর নৌবহর নিয়ে তিউনিস আক্রমণ করেন এবং তিউনিস বন্দর তছনছ করে উক্ত বাণিজ্যতরী ছিনিয়ে নেন।

এই পরাজয়ের গ্লানি খায়রুদ্‌দীন পাশাকে উত্তেজিত করে তুললো। তিনি ভ্রাতা উরূজকে রোগশয্যায় রেখেই সোজা জেরবা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে

নতুনভাবে তাঁর নৌবাহিনী সংগঠিত করেন। ইত্যবসরে সেনানায়ক উরূজও রোগমুক্ত হয়ে অনুজ খায়রুদ্দীনের সাথে মিলিত হন।

উরূজ তাঁর নৌবহরের লঙ্গর তুলে তড়িঘড়ি বুজেয়া পৌছেন। বুজেয়ার দুর্গ-প্রাকারে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। কয়েকদিন পর যখন দুর্গটির পতন আসন্ন হয়ে উঠছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে স্পেনের নৌ-সাহায্য এসে পৌছলো। অগত্যা উরূজ বাহিনীকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসতে হলো। উরূজ তাঁর অবশিষ্ট জাহাজগুলোয় আগুন লাগিয়ে ডুবিয়ে দিলেন, যাতে শত্রুপক্ষ তার দ্বারা উপকৃত হতে না পারে।

উরূজ এই ব্যর্থতার দরুন যারপরনাই লজ্জিত হলেন। তিনি তিউনিস প্রত্যাবর্তন না করে জাবালে বনী হিলালের এক গোপন পার্বত্য খাড়িতে আশ্রয় নিলেন এবং জাবালে বনী হিলাল করতলগত করেন।

জাবালে বনী হিলালবাসীরা সাংঘাতিক প্রগলভ ছিলো। তারা তাদের দলপতি ছাড়া অন্য কারোরই আনুগত্য স্বীকার করতো না। উরূজ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সুকোমল ব্যবহার দ্বারা তাদের অন্তর জয় করলেন। ফলে, তারা শুধু তাঁর নেতৃত্বই মেনে নিলো না, তাঁর নৌযুদ্ধগুলোতেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হতো।

স্পেনের হাজার হাজার গোত্র গ্রানাডা, আশ্বীলা, কাদিস ও আল্-ইয়ামামার সমৃদ্ধ শহরগুলো থেকে বিতাড়িত হয়ে আল্জিরীয় উপকূলে উদ্বাস্তুর ন্যায় পড়ে থাকতো। এখানেও স্পেনীয়রা উৎপীড়ন ও লুটতরাজ চালিয়ে তাদের সর্বহারায় পরিণত করতো।

আলজিরীয় শাসক সালীম শাহের স্থলবাহিনী শক্তিশালী ছিলো। কিন্তু তাঁর নৌবাহিনী ছিলো অতিশয় দুর্বল। তাই সালীম শাহ সেনানায়ক উরূজের কাছে নৌ-সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং বলেন যে, স্পেনীয় জুলুম থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা আমাদের একান্ত বর্তব্য।

আমীরুল বহর উরূজ ছিলেন একজন পাক্কা মুসলমান। তাঁর অন্তঃকরণ ছিলো মুসলমানদের সমবেদনায় ভরপুর। তিনি সালীম শাহের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন। পনেরোশ' ষোল খৃস্টাব্দে ছয় হাজার জওয়ানের একটি ছোট্ট নৌবাহিনী পানি-ভূমি উভয় পথে আলজিরীয় অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে স্থলবাহিনী শারশীল শহর পদানত করেন। শারশীল কেরাহ্ হাসান নামধেয় জনৈক তুর্কী শাসকের অধিকারে ছিলো। কেরাহ্ হাসান তার মুকাবিলা করতে গিয়ে নিহত হন। উরূজের স্থলবাহিনী সামনে অগ্রসর হলেন। এদিকে নৌসেনারাও আলজিরিয়া পৌছে গেলেন। আলজিরিয়ার অদূরবর্তী একটি দুর্গ স্পেনীয়দের অধিকারে ছিলো। উরূজ ইসলামের বিধি অনুসারে দুর্গবাসীদের বলে পাঠান যে, "তোমরা দুর্গ খালি করে মুসলিম ফৌজের সোপর্দ করলে

তোমাদের কোনো অনিষ্ট হবে না।" কিন্তু দুর্গাধিপতি জওয়াব দিলেন, "আমরা এমন মন-দিলের মানুষ নই যে, সামান্য নরম-গরম কথায়ই গলে যাবো। বুজেয়া দুর্গের কথা একটু স্মরণ রেখো।"

পরদিন থেকেই অবরোধ শুরু হলো। কুড়িদিন পর্যন্ত উরূজের বীরসেনারা দুর্গোপরি অগ্নিবর্ষণ করে। আরো কিছুদিন এরূপ গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকলে দুর্গটির নির্ঘাত পতন ঘটতো।

এই সময় এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলো। স্পেন-বিতাড়িত মুসলমান ও উরূজবাহিনীর মধ্যে কোনো এক ব্যাপারে বচসা হলো। বচসা বিদ্রোহের রূপ ধারণ করলো।

স্পেনীয়রা উরুজ বাহিনীর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। কিন্তু এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ধরা পড়লো। ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। দুর্গবন্দী খৃস্টান বাহিনী আশা করছিলো, এই বিদ্রোহের ফলে তারা অবরোধমুক্ত হবে। কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার ফলে তারা হতাশায় মুষড়ে পড়লো।

এবার তারা স্পেন সরকারের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করলো। স্পেনের নৌ-বিভাগ ডান ডি গোডী ভেরার সৈনাপত্যে সাত হাজার সশস্ত্র সেনার একটি নৌবহর প্রেরণ করলো। ডান ডি গোডী ভেরা ছিলেন একজন প্রবীণ পোড়খাওয়া নৌ-সেনাপতি।

এদিকে উরূজও কম অভিজ্ঞ ছিলেন না। উভয় বাহিনীর শক্তি পরীক্ষা শুরু হলো। প্রথম আঘাত আসলো ডান ডি গোডী ভেরার তরফ থেকে। উরূজ বাহিনী তা প্রতিহত করলেন। এক পর্যায়ে উরূজ বাহিনীর মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলে তিনি সহসা তাদের মধ্যে সাহস ফিরিয়ে আনেন। চারঘন্টা অবধি তুমুল সংঘর্ষের পর উভয় বাহিনীর ভাগ্য নির্ধারিত হলো। ডান ডি গোডী ভেরার শোচনীয় পরাজয় হলো। তিনি তাঁর একটি জাহাজও রক্ষা করতে পারলেন না।

স্পেনীয় খৃস্টান সরকার——যারা স্পেন থেকে মুসলিম শাসন উচ্ছেদ করে আত্মম্ভরিতায় ফেটে পড়ছিলো—এই পরাজয়ের পর ইউরোপীয় নৃপতিদের নিকট মুখ দেখানোরও অযোগ্য হয়ে পড়লো।

এরপর উরূজ তাঁর ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে স্থল ও নৌবাহিনী পুনর্গঠিত করেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে স্বীয় স্থলবাহিনী দ্বারা গোটা আলজিরিয়া দখল করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় উরূজ সমগ্র আলজিরিয়া শাসন করেন।

রাজ্যে অনিন্দ্য নিয়ম-শৃংখলা কায়েম করলেন। আলজিরিয়ার কয়েকটি উপকূলীয় খাড়ি-দুর্গ স্পেনের অধিকারে ছিলো।

উরূজ-সাম্রাজ্যের পরিধি ফেয ও মরক্কান সাম্রাজ্য অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিলো না। এবার তিনি (উরূজ) স্পেন উপকূলে প্রবল হামলা চালান। তাঁর হামলাকারী নৌকাগুলো প্রতিবার হাজার হাজার স্পেনীয় মজলুম মুসলমানকে উদ্ধার করে আনতো।

স্পেন তো তার কৃতকর্মেরই শাস্তি ভোগ করছিলো। কিন্তু সেই সাথে দক্ষিণ ইউরোপীয় নৌবহরগুলোও উরূজের নামে থরে কম্পমান ছিলো। জেনোয়া, নেপল্স ও ভেনিস উরূজের নৌ-হামলার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতো। ভূমধ্যসাগরের নৌ-চৌকিগুলো উরূজের দখলে ছিলো। তাঁকে সমুদ্রশুল্ক না দিয়ে কোনো নৌকারই রক্ষা ছিলো না।

ভূমধ্যসাগর থেকে উরূজের কর্তৃত্ব খতম করার মানসে স্পেনীয় নাবিকরা স্পেন সরকার সকাশে বহু আবেদন -নিবেদন করেন। কিন্তু স্পেনীয়রা উরূজের মুকাবিলা করার সাহস পেতো না।

অবশেষে পঞ্চম চার্লস ক্ষমতাসীন হয়ে এই উদ্দেশ্যে এক বিশেষ নৌবহর গঠন করেন। তিনি পনেরো হাজার নৌসেনা ও দশ হাজার স্থলসেনার এক বিশাল বাহিনী আলজিরিয়া প্রেরণ করেন।

ঘটনাচক্রে তখন উরূজ আলজিরিয়ার তেলস্মান অঞ্চলে এক ক্ষুদ্র স্থলবাহিনীর সাথে অবস্থান করছিলেন। তাঁর নিকট তখন কুল্লে দেড় হাজার সৈন্য ছিলো। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে টিড্ডীদল শত্রুসেনার মুকাবিলায় নামা অসমীচীন জেনেও তিনি পলায়ন করলেন না। বরং সৈন্য সন্নিবদ্ধে লেগে গেলেন।

স্পেনীয় বাহিনী তেলস্মানেই উরূজের ওপর হামলা করলো। উরূজ বাহিনীও প্রাণপণ মুকাবিলা করলেন।

জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, "কোথায় পনেরোশ' সৈন্যের এক ক্ষুদ্র দল, আর কোথায় দশ হাজার সৈন্যের এক প্রবল জনস্রোত। অথচ মুসলমানরা বিস্ময়কর বিক্রমে তাদের মুকাবিলা করেন। তাঁদের প্রতিটি মরদে মুজাহিদ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শার্দুলসম লড়াই করতে থাকেন। সংখ্যায় স্বল্প হলেও তাঁদের একটি সৈনিকও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন না। সকলেই শাহাদত বরণ করলেন।"

শহীদদের মধ্যে সেই বীরশ্রেষ্ঠ অমিতসাহসী আমীরুল বহরও ছিলেন, যার নাম শ্রবণে দক্ষিণ ইউরোপীয় খৃস্টান নাবিকরা ভয়ে কম্পমান থাকতো। উরূজের শবদেহ তাঁর ভাবগম্ভীর চেহারার দরুন সমস্ত শহীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলো। তাঁর হস্তে

ছিলো এমন এক তরবারি, যা স্পেনের মুসলমানদের প্রাণ রক্ষা করেছিলো—যার চমক দেখে খৃষ্টান বীর পাহ্‌লোয়ানরাও থরথর করে কাঁপতো।

আমীরুল বহর উরূজ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়ক্রমে শাহাদত বরণ করেন। ইসলামের এই বীর সন্তান দশাসই গাঁট্টাগোঁট্টা সুপুরুষ ছিলেন। শ্মশ্রু ও শিরকেশ লোহিতবরণ। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও সন্ধানী চোখ দুটি তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের পরিচায়ক। নাসিকা দীর্ঘকায় ও উন্নত। গৌরবর্ণের নূরানী চেহারা।

এই খ্যাতনামা বীর আমীরুল বহর আদৌ রক্তপিপাসু ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন কোমলপ্রাণ দয়ালু লোক। তবে যুদ্ধের ময়দানে তিনি সিংহের মতো গর্জন করতেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে এমন উজ্জ্বল কারনামা রেখে গেছেন, যার বিকিরণ মুসলিম নৌ-ইতিহাসের পত্রে পত্রে দীপ্তিমান।

সেনানায়ক উরূজ তাঁর উত্তরসুরি হিসেবে স্বীয় দুঃসাহসী বীর শিষ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রেখে যান। তিনিও ইসলামের নৌ-ইতিহাসে এমন কতক নিদর্শন রেখে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির রাজপথ বা ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে। বিশ্ব তাঁকে খায়রুদ্দীন পাশা বারবারোসা-ই আ'জম নামে স্মরণ করে থাকে। আজো তুর্কী নৌবহরগুলো সমুদ্রযাত্রাকালে বেকেশ্‌তাশ নামক স্থানে গোল্ডেন হর্নের দারাদানিয়ালে খায়রুদ্দীন পাশার সমাধি পানে নৌ-সালামের তোপ দেগে অগ্রসর হয়।

খায়রুদ্দীন পাশার চরিতামৃত সামনে আলোচিত হবে। একটু চিন্তা করে দেখো, উরূজ ও খায়রুদ্দীন পাশা তোমাদের মতোই নও-জওয়ান ছিলেন। তাঁরা তাঁদের যিন্দিগীকে ইসলামের পানে কতখানি উৎসর্গ করেছিলেন? দুই ভ্রাতাই স্পেনের লাখো নির্বাসিত মজলুম মুসলমানকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁদের নিরাপত্তাকল্পে স্বীয় জীবন পর্যন্ত বাজি রেখেছিলেন। এমনকি সহোদর ইলিয়াসকেও এই উদ্দেশ্যে শহীদ করিয়েছিলেন।

অথচ ইসলামী ইতিহাসে এই যুগটি ছিলো মুসলিম রাজ-রাজাদের স্বার্থপরতার যুগ। তাঁরা তাঁদের স্পেন-বিতাড়িত মুসলিম ভাইদের এতটুকু সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। ইসলামী ইতিহাসের এই করুণ কাহিনী তোমরা বড় হয়ে অধ্যয়ন করবে।

উরূজ ও খায়রুদ্দীন ভ্রাতৃযুগল খৃস্টান বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইসলাম তাদের অন্তঃকরণে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলো, যা অনেক সনাতন মুসলমানদের মধ্যেও অবশিষ্ট ছিলো না।

বস্তুত ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে তার পোষ্যপুত্রদের মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার সৃষ্টি করে। তোমরা ইসলামী ইতিহাসে এরূপ অনেক ব্যক্তিত্বের কথাই অধ্যয়ন করবে।

চেষ্টা করলে তোমরাও উরুজ ও খায়রুদ্দীন পাশার মতো মুসলিম নৌ-ইতিহাসে অনেক উজ্জ্বল কীর্তি রেখে যেতে পারবে! আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করুন!

আল্লাহ্ তখনই সাহায্য করবেন, যখন আমরা-তোমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করবো এবং বিশ্বমাঝে স্বীয় কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখে যাবো। অন্যথায় দুনিয়ায় আমাদের আগমন উদ্দেশ্যই নিরর্থক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন ইসলামের আজমত ও তারাক্কীর নিমিত্ত। তাই এ কাজে আমাদের প্রাণপাত করতে হলেও দ্বিধা করা অনুচিত।

সতেরো

আমীরুল বহর খায়রুদ্দীন পাশা

আজো আমীরুল বহর খায়রুদ্দীন পাশা বেকেশ্‌তাশে তাঁর সমাধি মাঝে আরামে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। সমুদ্রের তরঙ্গমালা চব্বিশ ঘন্টা বেকেশ্‌তাশকে চুমু খাচ্ছে।

— জনৈক ঐতিহাসিক

আমীরুল বহর খায়রুদ্দীন পাশার জন্যেই ইতিহাসে বারবারোসা বংশের এতো প্রসিদ্ধি। সুলতান মুহাম্মদ ছানী গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের আইউবিয়া জয় করে সেখানে এ্যাডমিরাল ইয়াকুবকে নিয়োগ করেন।

এ্যাডমিরাল ইয়াকুবের দু'জন প্রতিশ্রুতিশীল পুত্র ছিলো। উরূজ ও খায়রুদ্দীন পাশা। খায়রুদ্দীন পাশা তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার দরুন আমীরুল বহর বারবারোসা লাল দাড়িওয়ালা নামে সুবিখ্যাত। তিনি প্রথমদিকে কয়েকটি জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যতরীতে চড়াও হতেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি আফ্রিকার উপকূলভাগে হামলা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আলজিরিয়া আক্রমণ করে আলজিরিয়ার শহর ও তাঁর আশপাশ দখল করেন। কিন্তু খায়রুদ্দীন পাশা যখন দেখলেন যে, তিনি তাঁর এই রাজ্য কায়েম রাখতে পারবেন না, তখন তুর্কী সুলতান সালীমের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার দরখাস্ত করেন। এ হচ্ছে নয়শ' একচল্লিশ হিজরীর ঘটনা। তখন স্পেনের মজলুম মুসলমানদের ওপর সেখানকার খৃষ্টান সরকার চরম অত্যাচার চালাচ্ছিলো। খায়রুদ্দীন পাশা তাঁর নৌবহর দ্বারা হাজার হাজার মুসলমানকে স্পেন থেকে আলজিরিয়া পৌঁছে দেন।

সুলতান সুলায়মান তুরস্কে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর খায়রুদ্দীন পাশাকে উছমানীয় নৌ-বিভাগের আমীরুল বহর নিযুক্ত করেন। খায়রুদ্দীন পাশা সম্রাট চার্লসের বিশাল নৌবহরের ওপর হামলা চালান এবং চার্লসের বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি এনড্রিয়া ডোরীয়া অধিকৃত কোরন পেট্টাস ও অন্যান্য উপকূলীয় শহর পুনরুদ্ধার করে ইটালীর উপকূল আক্রমণ করেন।

অতঃপর সুলায়মান-ই-আ'জমের নির্দেশক্রমে তিনি উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত শহর ও বন্দর তিউনিস দখল করে আলজিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তিউনিসের সুলতান হাসান সম্রাট চার্লসের সাহায্য প্রার্থনা করলে চার্লস ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ পাঁচশ' জাহাজের একটি নৌবহর নিয়ে তিউনিস চড়াও করেন। খায়রুদ্দীন পাশা পরাস্ত ও তিউনিস ত্যাগে বাধ্য হন।

চার্লস বিজয়ীবেশে তিউনিস প্রবেশ করে মুসলমানদের ওপর নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চালান। তিনি ত্রিশ হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করেন এবং জোরপূর্বক খৃষ্টান বানান।

তিউনিস পতনের পর তুরস্ক ও ফ্রান্সের মধ্যে এক নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিলো প্রয়োজনকালে পরস্পরকে সাহায্য করা। নয়শ' বিয়াল্লিশ হিজরীতে ফ্রান্স ও চার্লসের মধ্যে এক নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সুলায়মান ফ্রান্সকে সাহায্য করেন। খায়রুদ্দীন পাশা তুর্কী নৌবহর নিয়ে চার্লসের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি কারফু দ্বীপ আক্রমণ ও অবরোধ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই কারফু অধিকৃত হয়। অতঃপর ঈজীয়ান সাগরের সমগ্র দ্বীপমালা দখল করেন। এইসব দ্বীপাঞ্চল ভেনিসের কর্তৃত্বাধীন ছিলো। আর এখন থেকে তুর্কীদের শাসনভুক্ত হলো।

নয়শ' পঁয়তাল্লিশ হিজরীতে হাঙ্গেরী সম্রাট পোপ ফার্ডিন্যাণ্ড চার্লস ও জামহুরিয়া-ই-ভেনিসের সাথে মিলে তুরকের বিরুদ্ধে 'পবিত্র ঐক্য' গঠন করেন। ঐক্যজোটের সমন্বিত নৌবহর সংখ্যায় ও শক্তিতে তুর্কী নৌবহর অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি ছিলো। চার্লসের প্রখ্যাতনামা নৌ-অধিনায়ক এনড্রিয়া ডোরীয়ার নির্দেশনায় প্রুসিয়া দ্বীপের সম্মুখে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয়।

সেনানায়ক ডোরীয়ার উপচেপড়া প্রসিদ্ধি ও খৃষ্টান নৌবহরের মিলিত শক্তিই খৃষ্টানদের বিজয় সুনিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট মনে হচ্ছিলো। কিন্তু খায়রুদ্দীন পাশার প্রচণ্ড আঘাতে তাদের ঐক্যশক্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়। অধিকৃত নৌ-এলাকাও তাদের হাতছাড়া হয়। খায়রুদ্দীন পাশা সমগ্র দ্বীপমালাই তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

আলজিরিয়ার ওপর খায়রুদ্দীন পাশার দখলদারী চার্লসের স্পেনীয় ও ইটালীয় অঞ্চলের জন্যে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই নয়শ' সাতচল্লিশ হিজরীতে চার্লস আলজিরিয়া অভিমুখে এক নৌবহর প্রেরণ করেন।

এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এর পরের বছর ফ্রান্স নাইস চুক্তি বাতিল করে পুনরায় চার্লসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ফ্রান্স তুর্কী নৌ-সাহায্যে নাইস নগর আক্রমণ ও দখল করেন।

ফ্রান্স তুর্কী নৌ-সাহায্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ টুলন বন্দর তুর্কীদের হাওয়ালা করেন।

নয়শ' একান্ন হিজরী থেকে নয়শ' তিপ্পান্ন হিজরী পর্যন্ত খায়রুদ্দীন পাশা অত্যন্ত বীরত্ব ও বিক্রমের সাথে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন নৌশক্তির মুকাবিলা করেন। তুর্কী নৌবহরও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করে। নয়শ' তিপ্পান্ন হিজরীর শেষপাদে খায়রুদ্দীন

পাশা ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর বিস্ময়কর বীরত্ব, রণ-নৈপুণ্য ও দৃঢ়তা দ্বারা কেবল তুর্কী সাম্রাজ্যের নৌ-বিজয়ই বৃদ্ধি করেন নি, উপরন্তু ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরেও তুর্কী নৌশক্তি শীর্ষে পৌছান। এমনকি ইউরোপের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সম্রাট পঞ্চম চার্লসও এককভাবে তাঁর মুকাবিলা করতে ভয় পেতেন। খায়রুদ্দীন পাশা ছিলেন জন্মগত সৈনিক। তিনি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সাথে নির্ভয়ে খেলা করতেন।

স্বীয় সম্পদ ও সময়ের বৃহদংশই তিনি নৌবহর ও নৌবাহিনী সংগঠনে ব্যয় করতেন। এক কথায়, খায়রুদ্দীন পাশার উঠা-বসা, হাঁটা-চলা, খাওয়া-পরা, শোয়া-জাগা-সবকিছুই ছিলো নৌবহর গঠনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

আর একারণেই খায়রুদ্দীন পাশার মহত্ত্ব ও সুখ্যাতি ইসলামী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আজো খায়রুদ্দীন পাশা বেকেশ্‌তাশে তাঁর সমাধি মাঝে স্বস্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। সমুদ্রের উর্মিমালা চব্বিশ ঘন্টা বেকেশ্‌তাশকে চুম্বন করছে।

খায়রুদ্দীন পাশা দেহত্যাগ করেন নব্বই বছর বয়ঃক্রমে। তিনি যদিও বেশি উঁচু-লম্বা ছিলেন না, কিন্তু খুবই সুশ্রী ও সুদর্শন ছিলেন। নৌ-জীবন যাপন হেতু তাঁর দেহাবয়ব সুঠাম ও সুগঠিত হয়েছিলো। দাড়ির কেশ ছিলো ঘন ও কুঞ্চিত। চোখ দুটি উজ্জ্বল, চমকদার ও বীরত্বব্যঞ্জক।

খায়রুদ্দীনের চেহারা থেকে এক বিশেষ ধরনের প্রতিপত্তি ঠিকরে পড়তো। সমুদ্র অভিযানে তাঁর দক্ষতা ছিলো অসাধারণ। শত্রুর ওপর এতো ত্বরিত ও তীব্র আক্রমণ চালাতেন যে, মুহূর্তে রাশি রাশি শত্রুসেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

বস্তুত খায়রুদ্দীন পাশা ছিলেন সমকালের অতুল্য ও অনন্য নৌ-অধিনায়ক। তিনি পরাজিত শত্রুর সাথে বিনম্র ও সদয় ব্যবহার করতেন। অধীনস্থ কর্মচারী ও সৈন্যদের সুখ-সুবিধার প্রতিও সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন।

নৌযুদ্ধে তাঁর উৎসাহ ছিলো অদম্য ও দুর্নিবার। তাই জাহাজ নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মাঝি-মাল্লা ও খালাসীর কাজ পর্যন্ত স্বহস্তে আঞ্জাম দিতেন।

খায়রুদ্দীন পাশা ইসলামের সাচ্চা জাননিছার ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর চৌদ্দ বছরের নৌসৈনাপত্য ইসলামী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুর্কী রাজত্বের

অনেককাল পর্যন্ত তুর্কী নৌবহর যুদ্ধ যাত্রাকালে খায়রুদ্দীনের মাযারে ফাতিহা ও তোপদাগার মাধ্যমে সালামী দিয়ে গোল্ডেন হর্ন থেকে নোঙ্গর তুলতো।

সত্যই দুনিয়ায় শ্রম ও সাধনা সম্মান বয়ে আনে। তোমরাও সম্মান কুড়াতে চাইলে খায়রুদ্দীন পাশার মতো সমুদ্র-তরঙ্গের সাথে খেলতে শিখো।

আঠারো

আমীরুল বহর হাসান আগা

দুঃসাহসী আমীরুল বহর হাসান আগা তিহাত্তর বছর বয়ঃক্রমে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং স্বীয় উত্তরসুরিদের জন্যে বহু গৌরবময় কীর্তি রেখে যান।

— জনৈক ঐতিহাসিক

খায়রুদ্দীন পাশা বড় মানুষচেনা লোক ছিলেন। তিনি তাঁর নৌসৈনাপত্যকালে সুবিখ্যাত বাহাদুর ও নামযাদা বীরপুরুষ হাসান আগাকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন।

খায়রুদ্দীন পাশা হাসান আগাকে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। স্বীয় তত্ত্বাবধানে তাঁকে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনিও তা অতি দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেন।

খায়রুদ্দীন পাশার মৃত্যুর পর উছমানীয় গভর্নমেন্ট হাসান আগাকে আলজিরিয়ার গভর্নর ও আমীরুল বহর নিযুক্ত করেন। তদানীন্তন আলজিরিয়ার গভর্নর ও আমীরুল বহর নিযুক্ত করেন। তদানীন্তন ইউরোপীয় নৌবহর মুকাবিলায় তুরস্কের মশহুর আমীরুল বহর তুরগুত পাশা ও তাঁর সহকারী সালিহ্ রঈস সন্দে-সিকান্দারীতে পরিণত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ইউরোপীয় নৌ-অধিনায়ক তাঁদের নাম শুনে ভয়ে কাঁপতেন এবং স্বীয় নৌবহরসহ আড়ালে-আবডালে পালিয়ে বেড়াতেন। মুক্ত সাগরে আত্মপ্রকাশ করার হিম্মতই তাঁর হতো না।

স্পেনের মুসলিম বিতাড়নের পর সম্রাট চার্লস খৃষ্টান নৌবহরগুলো সন্নিবদ্ধ করেন। তিনি নৌ-হামলা চালিয়ে আলজিরিয়াকে কব্যা করতে চাইলেন এবং এ উদ্দেশ্যে গ্রীষ্ম মওসুমকে মনোনীত করলেন। ইউরোপের খ্যাতনামা নৌসেনাপতিও তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।

এই নৌ-জোটে ইটালী, ভেনিস, স্পেন ও জার্মানীর নৌবহর অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ক্রুশেডের নৌদস্যুরাও এই অভিযানে শরীক হয়।

যা হোক, এই সম্মিলিত নৌবহর সেনানায়ক ডোরীয়ার নেতৃত্বে আলজিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা দিলো। কিন্তু স্পেঞ্জা বন্দর ত্যাগ করা মাত্রই ঝড়ের সম্মুখীন হলো। ঝড়ের প্রচণ্ড তোড়ে সমুদয় নৌবহর বিপরীত দিকে রওয়ানা দিলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে করসিকা দ্বীপ সামনে পড়লে সেখানে আশ্রয় নিলো।

ঝড় থেমে যাওয়ার কয়েকদিন পর ডোরীয়া নোঙ্গর তোলার নির্দেশ দেন এবং আফ্রিকা মহাদেশের কূল ঘেঁষে ঘেঁষে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ত্রস্তপদে অগ্রসর হন।

মিনারকা দ্বীপের অদূরে পৌঁছতেই প্রবল ঝড় আরম্ভ হলো। ঝড়ের তাণ্ডবে জাহাজরাজির মাস্তুল বাঁকা হয়ে গেলো। পালের ডাণ্ডাগুলো ফেটে গেলো। চাঁদোয়ার কাপড়গুলো উড়ে গেলো। এবং জাহাজগুলো আয়ত্তের বাইরে চলে গেলো।

ডোরীয়া কোনোমতে নিকটবর্তী দ্বীপ-বন্দরে গিয়ে পৌঁছলেন। এ স্থানটি ছিলো ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিকস্থ নৌবহরসমূহের মিলনকেন্দ্র। এখান দিয়ে পামা প্রণালীতে দক্ষিণ ইউরোপীয় সমুদয় নৌশক্তি আলজিরিয়ার মুকাবিলায় একাট্টা হলো।

নৌবহরগুলোর শ্রেণী-বিন্যাস ছিলো নিম্নরূপ ঃ সর্বাগ্রে স্পেনের বিশেষ রাজ-বহর। এই বহরে একশ' যুদ্ধজাহাজ ছিলো। জার্মানী ও ইটালীর বাছা বাছা রণবীর এবং কুলোনা ও স্পীনোযার মতো বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ নৌসেনাপতির পরিচালনাধীন ছিলো।

স্পেনীয় নৌবহরের পর নেপলস্ ও পালার্মোর দেড়শ' যুদ্ধজাহাজ অতঃপর নোভী ম্যান্তোযার দুইশ' জাহাজ। এগুলো কিল্লাবিধ্বংসী তোপখানা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র সজ্জিত ছিলো। দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধাভিজ্ঞ নৌসেনার পল্টনও ছিলো। এইসব নাবিক ছিলেন স্পেনের শ্লাঘা ও গৌরবের পাত্র।

মোটের ওপর সমস্ত মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক পর্বতসম যুদ্ধজাহাজ, তোপখানা, বারো হাজার নৌ ও চব্বিশ হাজার স্থলসৈন্য ছিলো। এইসব জাহাজে পোপের ভক্তদলও প্রার্থনারত ছিলো। এতোসব ইন্‌তিজাম সহকারে ডোরীয়া আলজিরিয়া রওয়ানা দিলেন।

চার্লসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এই অভিযানে সম্মিলিত নৌবহর অবশ্যই সফলকাম হবে। পনেরোশ' পঁচিশ খৃষ্টাব্দের তিউনিস যুদ্ধে চার্লস আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এই বিশাল নৌবহর দেখে আলজিরীয়বাসিগণ হতোদ্যম ও ভীত হয়ে পড়বেন।

ডোরীয়া এক বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর নৌ-জাহাজগুলো আলজিরিয়ার অদূরে সন্নিবেশিত করলেন। ঐক্যজোটের নৌবহর বন্দরের কিঞ্চিৎ দূরে এসে নোঙ্গর ফেললো।

হাসান আগা শত্রুর আগমন সংবাদ পেয়ে প্রতিরোধের পরিকল্পনা আঁটলেন। তিনদিন পর্যন্ত আলজিরীয়দের কোনো প্রতিরোধেরই প্রয়োজন পড়লো না। কারণ, প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা ও বৃষ্টিপাতের দরুন হামলাকারীরা কদম জমাতেই সক্ষম হয়নি। চতুর্থ দিন ঝড় থামার পর সমন্বিত বাহিনী অবরোধ-উপকরণসমেত ভূমির ওপর শিবির স্থাপন করলো।

আরব ও বারবার বাহিনী পার্বত্য গোপন ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতেছিলেন। তারা অতর্কিতে শত্রু শিবিরে ঝাপিয়ে পড়লেন। আরবরা বেপরোয়াভাবে আক্রমণ শুরু করলেন। তারা শৈলশৃঙ্গ থেকে বড় বড় প্রস্তর গড়িয়ে দিতে লাগলেন। ফলে বিপুল শত্রুসেনা নিহত ও বন্দী হলো। কিন্তু হামলাকারীরা হুড়মুড় করে সামনে অগ্রসর হলো এবং নগর প্রাচীরের নিকটবর্তী হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়লো।

আগা হাসান তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি--একুনে আটশ' তুর্কী ও পাঁচ হাজার আরব ও বারবার সৈন্য নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। চার্লস তাঁকে (আগা হাসান) পয়গাম পাঠালেন, "অনর্থক সৈন্য ক্ষয় না করে শহরটি আমাদের সোপর্দ করে দাও। অন্যথায় আমরা তা ধূলিসাৎ করে দেবো।" কিন্তু সুবীর সেনাপতি আগা হাসান জওয়াব দিলেন, "স্বয়ং তলোয়ারই তার ফয়সালা করবে।"

উভয় বাহিনীর বিপরীত মনোভাব দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, আজ বুঝি আলজিরিয়ার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। কেননা, ইউরোপের সমগ্র শ্রেষ্ঠ বাহাদুর আলজিরিয়ার নগরপ্রান্তে সমুপস্থিত। তাঁরা আলজিরিয়ার পতন ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ। ইউরোপীয় তোপ-কামানগুলোও আলজিরীয় দেওয়ালের দিকে তাক করানো।

এহেন সংকটময় মুহূর্তে এক প্রচণ্ড তুফান শুরু হলো। কৃষ্ণমেঘের ঘনঘটা চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হলো। আকাশফাটা বজ্রনিনাদ মানুষের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, স্বয়ং প্রকৃতিও যেনো আলজিরীয়দের সমর্থনে তার সকল শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করছে।

আরব সেনাবাহিনী খৃষ্টান হানাদারদের হামলা করলেন। শত্রুরাও প্রত্যুত্তর দিলো। প্রত্যুত্তর অতি প্রবল ছিলো। আরবগণও প্রাচীর শিখর থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করলেন। ফলে শত্রুসেনার বৃহদংশই ধ্বংশ হলো। এবার আগা হাসান শহর থেকে বাইরে এসে সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হামলার চোট সামলাতে না পেরে তারা পিঠটান দিলো।

পরের দিন বিশ্রামের জন্য সমন্বয় বাহিনী জাহাজে চড়লো। অমনি পুনরায় মেঘবৃষ্টির তুফান এলো। ফলে সমন্বয় বহরের নাটবল্টু ঢিলা হয়ে গেলো। জাহাজগুলো পরস্পরে ঠোকাঠুকি করে ধসে পড়লো। একশ' পঞ্চাশটি গিরিবৎ নৌ-জাহাজ পানিতে বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেলো। সাথে সাথে দুই হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌযোদ্ধাও সমুদ্রে তলিয়ে গেলো।

ডোরীয়া এই সময় সাবধানতা অবলম্বন করলেন। তিনি বহুসংখ্যক রণতরী টেমগুফাস্ট উপসাগরে পৌছে দিলেন। এই স্থানটি সুরক্ষিত ছিলো। চার্লসও শেষ পর্যন্ত টেমগুফাস্টে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

এহেন ধ্বংসযজ্ঞের পর সমন্বিত বহরের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে চার্লস তীরবর্তী রাস্তা দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্ত আগা বাহিনী পিছন থেকে হামলা করে তাদেরও ব্যাপকাংশ ধ্বংস করলেন।

টেমগুফাস্ট উপসাগরে পৌঁছে হতাবশিষ্ট সৈনিকসহ চার্লস ও ডোরীয়া বুজেয়া বন্দরে উপস্থিত হলেন। সমন্বয় বাহিনী ভুক-পিয়াস ও ক্লান্তিতে ঢলে পড়লো। বুজেয়া বন্দরে বুভুক্ষু সৈন্য ও ভাঙ্গা জাহাজগুলো এসে থামলো।

সবশেষে চার্লস ও ডোরীয়া যখন বিফল মনোরথ হয়ে স্পেন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন স্পেনবাসীরা তাঁদের অভিসম্পাত দিতে লাগলো। কেননা, সাধারণ সিপাহী ছাড়াও এই অভিযানে হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ বীর সেনানীর প্রাণহানি ঘটেছিলো। তাঁদের মৃত্যুতে কয়েক মাসব্যাপী গভীর শোক পালিত হয়।

অতি অহংকার ও প্রগল্‌ভের সাথে যে যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হয়েছিলো, অতিশয় অপমান ও হেনস্তার সাথে তার সমাপ্তি ঘটলো। এই সমরে হাজার হাজার জাহাজ, কামান ও রসদপত্র আলজিরিয়ার হস্তগত হলো।

অধিকন্তু এই যুদ্ধে আলজিরীয়দের সাহস-হিম্মত সহস্রগুণ বেড়ে গেলো। কিন্তু স্পেনীয়দের এই পরাজয়েও লজ্জা হলো না। সেনাপতি জুরীন ডি লা এই ব্যর্থতার কৈফিয়ত লিখতে গিয়ে নিম্নোক্ত ভাষায় সাফাই গেয়েছেনঃ "আলজিরিয়ার আবহাওয়া বীরত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত নয়!"

আমীরুল বহর আগা হাসানের যুদ্ধজ্ঞান আলজিরিয়াকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলো। অন্য কোনো আমীরুল বহর এতো সহজে সমন্বয় বাহিনীর মুকাবিলা করতে পারতেন না।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাকৃতিক ঝড়-তুফান ইত্তিহাদী নৌবহরকে কদম জমাতে দেয়নি। কিন্তু আমীরুল বহর আগা হাসানের রণকৌশল তুফানের আগেই যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

এই রণবীর আমীরুল বহর তিহাত্তর বছর বয়ঃক্রমে ইহলোক ত্যাগ করেন আর পরবর্তী বংশধরদের জন্য বহু শানদার কারনামা রেখে যান।

ঘোর তমসালিপ্ত আজকের মুসলিম সমাজ এই আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে প্রগতির রাজপথে চলতে পারে।

সন্দেহ নেই, আগা হাসানের উজ্জ্বল কারনামা ইতিহাস বইতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে একজন মহান সমরবিদ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার বড় প্রমাণ হলো, তিনি ইউরোপীয় সমন্বয় বাহিনীকে যে শোচনীয় মার দিয়েছিলেন, তা বহুকাল পর্যন্ত তারা ভুলতে পারেনি।

উনিশ

আমীরুল বহর তুরগুত পাশা

তুরগুত পাশা ছিলেন সমসাময়িককালের মস্ত বাহাদুর, যুদ্ধার্থী ও সমর-শার্দূল। সমকালের আমীরুল বহরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রণবীর। খায়রুদ্দীন পাশার সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমীরুল বহর ডোরীয়ার চাইতেও অধিক বলশালী। তিনি বড় বড় আমীরুল বহরকে ধরাশায়ী করেছিলেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

খায়রুদ্দীন পাশা বারবারোসা ব্যতীত সুলয়মান-ই-আ'জমের আরো দু'জন খ্যাতনামা আমীরুল বহরের খিদমত লাভের সৌভাগ্য হয়েছিলো। তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব ও নৈপুণ্যের দাপটে ভূমধ্যসাগর ও তার উপকূলাঞ্চলসমূহ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো।

একজনের নাম তুরগুত পাশা ও অপরজন পিয়ালে পাশা। তুরগুত পাশা বাল্যকাল থেকেই সমুদ্রপ্রিয় ছিলেন। তাই শুরুতেই তিনি এক নৌবহর গঠন করেন। একবার তিনি ত্রিশটি জাহাজের এক নৌবহর দ্বারা রোমান করসিকা দ্বীপে হামলা চালান। কিন্তু খৃষ্টান আমীরুল বহর এনড্রিয়া ডোরীয়া তুরগুত পাশাকে গ্রেফতার করে তাঁর সমুদয় নৌ-জাহাজ ও মাঝিমাল্লাকে আটকে রাখেন।

কয়েক মাস যাবত তুরগুত পাশা এনড্রিয়া ডোরীয়ার কারাগারে বন্দী রইলেন। ইত্যবসরে খায়রুদ্দীন পাশা বারবারোসা এনড্রিয়া ডোরীয়াকে হুমকি দেন যে, "অবিলম্বে তুরগুত পাশাকে তাঁর মাঝিমাল্লা ও জাহাজসুদ্ধ ছেড়ে না দিলে আমি জেনোয়াকে ধূলিসাৎ করে দেবো।"

ডোরীয়া তুরগুত পাশাকে তাঁর মাঝিমাল্লা ও জাহাজসহ মুক্ত করে দেন। বস্তুত তুরগুত পাশা ছিলেন রণকুশলী ও বাহাদুর হিসেবে খায়রুদ্দীন পাশার সমকক্ষ।

দওলত-ই উছমানিয়া তুরগুত পাশাকে আমীরুল বহর মনোনীত করেন। তিনি প্রবল নৌ-হামলা দ্বারা ইটালী ও স্পেনের উপকূলভাগ পদানত করেন। ইটালীয় ও স্পেনীয় নৌ-বহরগুলো তুরগুত পাশার নাম শুনে কাঁপতো।

তুরগুত পাশা এতো ক্ষিপ্র ও কার্যকরভাবে নৌ-হামলা চালাতেন যে, শত্রু বাহিনী নিজদের সামাল দেয়ারও সুযোগ পেতো না। কোনো কোনো সময় তিনি উছমানীয় মিত্রদের ওপরও হামলা করে বসতেন।

একবার তিনি ভেনিসের কয়েকটি জাহাজ গ্রেফতার করে আনেন। সুলায়মান-ই-আ'জম তার কৈফিয়ত তলব করে তাঁকে কনস্টানটিনোপল ডেকে পাঠান। কিন্তু তুরগুত পাশা কনস্টানটিনোপল না এসে স্বীয় নৌ-বহরসহ মরক্কো চলে যান এবং মরক্কো সুলতানের চাকরি গ্রহণ করেন।

তিনি মরক্কো নৌবাহিনী সংগঠিত করে তাকে সমৃদ্ধির উচ্চ-শিখরে পৌঁছে দেন।

খায়রুদ্দীন পাশার ইন্তিকালের পর দওলত-ই-উছমানিয়া তুরগুত পাশার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। তাই সুলায়মান-ই- আ'জম তুরগুত পাশাকে ক্ষমা করে দিয়ে পরম সমাদরে কন্‌স্টানটিনোপল নিয়ে আসেন এবং আমীরুল বহর পদে অধিষ্ঠিত করেন।

এরপর তুরগুত পাশা ত্রিপোলী আক্রমণ করেন। ত্রিপোলী তখন ক্রুশেডারদের করতলগত। ক্রুশেডারদের কেন্দ্রভূমি মাল্টা। মাল্টায় তাদের যবরদস্ত নৌশক্তি। তুরগুত পাশা সেটি জয় করে উছমানীয় শাসনে আনেন। এরপর তিনি ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি আফ্রিকীয় সকল নৌবন্দরের নিরাপত্তা বিধান এবং জাহাজ নির্মাণ কারখানাসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করেন।

নয়শত' তিহাত্তর হিজরীতে কন্‌স্টানটিনোপল থেকে তুর্কী নৌবহর মাল্টা আক্রমণ করে। তুরগুত পাশা তাঁর নৌবহরসহ ত্রিপোলী থেকে ছুটে আসেন এবং তুর্কী নৌবহরের পক্ষে প্রাণপণ লড়াই করেন। কিন্তু যুদ্ধকালে তিনি গোলার আঘাতে আহত হয়ে শাহাদত বরণ করেন।

তুরগুত পাশা তাঁর সমসাময়িককালের মস্ত বাহাদুর, যুদ্ধার্থী ও সমর-শার্দূল ছিলেন। সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ রণনায়ক। খায়রুদ্দীন পাশার সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমীরুল বহর ডোরীয়ার চাইতেও অধিক বলবান। তিনি বড় বড় আমীরুল বহরকে কুপোকাত করেছিলেন।

বস্তুত আমীরুল বহর তুরগুত পাশা ছিলেন নৌ-যুদ্ধের এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রতিনিয়ত সৈনিক জীবন যাপন করতেন। উচ্চ পদমর্যাদার জন্যে তিনি কখনো লালায়িত ছিলেন না। বরং দেশ ও জাতির জন্যে ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। জয়-পরাজয়ের কথা তিনি কখনো ভাবতেন না।

তিনি ছিলেন পরাজিত শত্রু বিশেষ করে কারাবন্দীদের সত্যিকার বন্ধু ও সহকর্মী। অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল, স্বাধীনচেতা ও নিরহঙ্কার।

অধীনস্থদের তিনি সর্বদা সমঅধিকার দান করতেন। তাঁর লোক-লশ্‌কর সবসময় তাঁর অনুগত থাকতো। নৌসেনাপত্যে তাঁর পরিপক্কতা ছিলো প্রশ্নাতীত। তাঁর তিরোধানের প্রায় আড়াইশ' বছর পর ইংরেজ আমীরুল বহর লর্ড নিল্‌সনের মৃত্যু হয়। দু'জনেরই একই রকম মৃত্যু ঘটেছিলো। দু'জনই সত্য-সৈনিকের ন্যায় কর্তব্য পালনকালে ঘোর যুদ্ধে যখমী হয়ে মারা যান। উভয়জনই এরূপ পরিণামের প্রত্যাশী ছিলেন।

তুরগুত পাশার জীবন থেকে আমরা বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও ত্যাগের শিক্ষা পাই। তোমরাও তুরগুত পাশার মতো সৈনিক হও।

বিশ

আমীরুল বহর আলাল্ উলূজী পাশা

আমীরুল বহর আলাল্ উলূজী পাশার উপাধি ছিলো মুআয্যিনযাদা। তিনি দওলত-ই-উছমানিয়ার আমীরুল বহর ছিলেন। তার নৌ-কীর্তিকাণ্ড খায়রুদ্দীন পাশার চেয়ে আদৌ অকিঞ্চিৎকর ছিলো না। তুরগুত পাশার মতো নির্ভীক দুঃসাহসী ছিলেন। নৌ-অভিযান চালিয়ে শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। তুর্কী আমীরুল বহরদের মধ্যে সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ ছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

আলাল্ উলূজী পাশা তুরগুত পাশা ও খায়রুদ্দীন পাশার মতো বীর, সাহসী ও অনন্য আমীরুল বহর ছিলেন। তিনি তুরগুত পাশার সার্থক শাগ্‌রিদ ছিলেন। খায়রুদ্দীন পাশার মতো নির্ভীক ও তাঁর পদাঙ্কানুসারী।

আলাল্ উলূজী পাশা কাল্‌বিরিয়ার এক খৃস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলজিরিয়ায় আগমন করে ইসলামে দীক্ষিত ও নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। প্রথমে তিনি মাল্লার কাজ করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে আমীরুল বহরে উন্নীত হন।

আলাল্ উলূজী পাশা তিউনিসে রাজত্ব করেন। আফ্রিকার উপকূল নিয়ন্ত্রণ ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা পুনর্গঠিত করেন।

এরপর তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত করেন। পনেরোশ' সত্তর খৃস্টাব্দে তিনি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করতে গিয়ে সাকালিয়া উপকূলে ক্রুশেড বহরের সম্মুখীন হন। এই নৌবহরে পাঁচটি রণপোত ছিলো। এগুলো বিখ্যাত ক্রুশেড সেনাপতি ক্লেমেন্টের পরিচালনায় লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে মাল্টা গমন করছিলো।

আল্‌কাতাই বন্দরে উভয় নৌবহরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রুশেড বাহিনী মুকাবিলার অক্ষম হয়ে তিনটি জাহাজ উলূজী পাশাকে উপঢৌকন পাঠালো।

ক্রুশেডদের এই লুণ্ঠিত বহর মাল্টা ফিরে গেলে তারা ক্লেমেন্টের ওপর এতোই কুপিত হন যে, পোপ অতি কষ্টে তাঁর জান বাঁচাতে সক্ষম হন। কিন্তু মাল্টাবাসীরা ক্লেমেন্টকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর লাশ নদীতে নিক্ষেপ করে।

পনেরোশ' একাত্তর খৃস্টাব্দে ক্রুশেডরা আল্‌কাতাই'র এই ক্ষুদ্র পরাজয়ের বিরাট প্রতিশোধ নিলো। আর সত্য বলতে কি, কিছুকালের জন্যে ক্রুশেডদের নৌশক্তি আলজিরিয়া ও কনস্টান্‌টিনোপলের মিলিত নৌশক্তিকে একদম কাবু করে ফেলেছিলো।

খায়রুদ্দীন পাশা সেনাপতি ডোরীয়ার পরিচালনাধীন ভেনিসের রাজকীয় নৌবহরকে প্রেভেসার অদূরে পর্যুদস্ত করেছিলেন। ফলে ভেনিসের রাজকীয় নৌশক্তি চিরতরে খতম হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের উদ্দীপনা তখনো কিছুটা বাকী ছিলো। যখনই কোনো খৃস্টান শক্তি তাদের পোষকতায় এগিয়ে আসতো, তখনই তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো।

ভেনিসের সমুদয় সমৃদ্ধ বন্দর ও নৌছাউনিসমূহ দওলত-ই-উছমানিয়া করকবলিত হলেও তখনো ভেনিসের দখলে কিছু ভালো দ্বীপ রয়ে গিয়েছিলো।

এইসব দ্বীপদেশের মধ্যে সাইপ্রাস ছিলো অন্যতম। সাইপ্রাস ছিলো গ্রীক সাগ ভেনিসের অতীত নৌ-আধিপত্যের স্মারকস্বরূপ। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে এর চেয়ে ব কোনো সুরক্ষিত স্থান আর ছিলো না। এখানে ছিলো সমররত সৈনিকদের উত্তম ছাউনি অস্ত্রশস্ত্রের উত্তম ভাণ্ডার এবং ফৌজী রসদপত্রের উত্তম গোডাউন।

সাইপ্রাস দ্বীপের প্রাকৃতিক অবস্থান সমরাভিযান পরিচালনার পক্ষে খুবই অনুকূ ছিলো। এখানে অবস্থান করে সমগ্র গ্রীক সাগরে নাবিকদের নিঃক্লেশে পর্যবেক্ষণ ক যেতো। শত্রুপক্ষের সমস্ত গতিবিধিও অবগত হওয়া যেতো।

এই দ্বীপভূমির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের নৌদস্যুর এটাকে তাদের আশ্রয়স্থল মনে করতো। তাই সুলতান দ্বিতীয় সালীম ভেনিস রাজ্যে এই দ্বীপটি দখল করতে কৃতসংকল্প হন।

ভেনিসীয় নৌবহর ইউরোপীয় নৌবহরের লুণ্ঠননীতিতে মদদ যুগিয়েছিলো। তাই দওলত-ই-উছমানিয়া পনেরোশ' সত্তর খৃষ্টাব্দে ভেনিসকে নৌযুদ্ধের আহবান জানান।

ভেনিস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ক্রুশেডদের সাহায্যপ্রার্থী হলো। ক্রুশেডরাও ভেনিসের সাহায্যে সাড়া দিলো। তারা ইউরোপের সকল নৌশক্তির মদদ চাইলো ইউরোপীয় বিভিন্ন নৌবহর এগিয়ে এলো। দুইশ' ছয়টি নৌ-জাহাজ ও আটচল্লিশ হাজার নৌসৈন্য প্রস্তুত হলো। মার্ক এন্টনি এই সম্মিলিত বাহিনীর মীরবহর নিযুক্ত হলেন।

দওলত-ই-উছমানিয়ার তরফ থেকে আলাল্ উলূজী পাশা বারবার নৌবহরকে পিয়ালে পাশা ও লালা মুস্তাফার নেতৃত্বে সোজা সাইপ্রাস অভিমুখে চালনা করেন এবং স্বয়ং দুশমনের শক্তি পরিমাপ নিবন্ধন ইটালীর উপকূলে নোঙ্গর ফেলেন। কেননা, এখান থেকে অতি সহজেই সম্মিলিত বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করা যেতো।

আলাল্ উলূজী পাশা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করলেন যে, শত্রুপক্ষের বিশাল নৌবহর ও বিপুল বাহিনী সাইপ্রাস অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু উলূজী পাশা তাঁর ক্ষুদ্রকায় নৌবহর এতোটুকু বিচলিত হয়নি।

এছাড়া, খৃষ্টান মীরবহরদের ওপর বারবার নৌবহরের প্রভাব ছিলো অত্যধিক। তাই লালা মুস্তাফা ও পিয়ালে পাশার সীমিত শক্তি সত্ত্বেও বারবার নৌবহর সাইপ্রাসের রাজধানী ও নিকোশিয়া বন্দর দখল করে হিলালী নিশান উড়িয়ে দেন।

এদিকে ইটালীর উপকূল থেকে উলূজী পাশাও সাইপ্রাস আগমন করেন। তিনি তাঁর সমুদয় নৌসেনা জাহাজ থেকে নামিয়ে দ্বীপের অভ্যন্তর বিজয়ে নিয়োগ করলেন।

এই সময় খৃস্টান বাহিনী তুর্কী শূন্য জাহাজগুলোকে নিঃক্লেশে ডুবিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তারা অহেতুক আত্মাভিমান ও অহমিকার দরুন এই সুযোগ হাতছাড়া করলো। ফলে নিকোশিয়া জয় করার পর সাইপ্রাসের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ফীমাগুস্তাও তুর্কীরা অধিকার করলেন। এইভাবে উলূজী পাশা সমন্বিত নৌবহরকে গ্রীকসাগরে পর্যুদস্ত করেন।

আলাল্ উলূজী পাশা স্বীয় ও বারবার নৌবহরসহ গ্রীকসাগর থেকে নোঙ্গর তুলে লোপান্টো উপসাগর দিয়ে এ্যাড্রিয়াটিক হ্রদে প্রবেশ করেন এবং সেখানে নোঙ্গর ফেলে খৃস্টান সমন্বিত নৌবহরের অপেক্ষা করতে থাকেন।

সম্ভবত উলূজী পাশার মনে তুর্কী ও বারবার বহরের ওপর বেশি অহংকার জন্মেছিলো। পূর্ববর্তী বিজয়গুলোই তাঁকে অতিমাত্রায় আত্মম্ভরি করে তুলেছিলো। তাই শত্রুর শক্তিকে তিনি হীন জ্ঞান করলেন।

উলূজী পাশা আরো এক ভুল ধারণায় পতিত হয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, খায়রুদ্দীন বারবারোসা যেরূপ ভেনিসীয় খৃস্টান মীরবহর ডোরীয়াকে প্রেভেসায় পরাজিত করেছিলেন, তদ্রূপ তিনিও খৃস্টান ঐক্যশক্তিকে লোপান্টোতে পরাভূত করবেন।

একাল ও সেকালের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিলো। খৃস্টান নৌবহরগুলোকে ক্রুশেডাররা সংঘবদ্ধ করেছিলো। তাছাড়া, খৃস্টান ধর্মযাজকরা তাঁদের অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে নৌসেনাদের উত্তেজিত করে তুলেছিলো।

তুর্কী নৌবহর উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলো। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের স্থবিরতার সৃষ্টি হলো। ওদিকে খৃস্টান নৌবহরও ক্রমাগত পরাজয়ে পরম অপমান বোধ করেছিলো। এই অপমানবোধ তাদেরকে মারমুখী করে তুলেছিলো।

এছাড়া, খৃস্টানদের নতুন মীরবহর নিযুক্ত হয়েছিলেন ডন জন অব অস্ট্রিয়া। তাঁর পিতা গ্রেট চার্লস দক্ষিণ ইউরোপীয় খৃস্টান বহরকে তুর্কীদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই ডন জন অব অস্ট্রিয়া ছিলেন একজন স্বনামধন্য মীরবহরের সুযোগ্য সন্তান। তিনি তখন বাইশ বছরের নওজওয়ান। যৌবনের উদ্দামতায় প্রাণোচ্ছল। তাঁর বৈপিতৃক ভ্রাতা ফিলিপ স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন ও হত্যাকাণ্ডে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছিলো।

যে ব্যক্তির বাপ-ভাই ছিলো মুসলমানদের জানী দুশমন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার বৈরিতার আবেগ ও অভিসন্ধি কতোটা প্রকট ছিলো, তা সহজেই অনুমেয়।

ডন জন অব অস্ট্রিয়াকে দক্ষিণ ইউরোপীয় সমুদয় নৌবহরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো। আর এটা তাঁর মতো একজন সাহসী নায়কের পক্ষে মোটেই দুরূহ কাজ ছিলো না। কেননা, তাঁর বংশীয় ঐতিহ্যই একাজে তার হিম্মত যোগাতে যথেষ্ট ছিলো।

খৃস্টান ঐক্যবহর তুর্কী বহরের মুকাবিলায় মাসীনা উপসাগরে ঢুকলো। প্রথম নৌবহরটি প্রবেশ করলো সেনাপতি ভীযূর পরিচালনায়। ভীযূর নৌবহরে আটচল্লিশটি রণপোত ছিলো।

দ্বিতীয় নৌবহরটি—যার সেনানায়ক ছিলেন ডন জন অব অস্ট্রিয়া—ষাটটি রণপোতসহ বারসিলোনা হয়ে লিওন উপসাগরে ঢুকলো। বারসিলোনা থেকে যাত্রা করার সময় পোপ পীস ডন জনকে পবিত্র পতাকাও সাফল্যের শুভাশিস দেন।

মাসীনা উপসাগরে ঢুকে স্বীয় নৌবহরকে উৎসাহ দানকল্পে বিউগল বাজিয়ে উক্ত পবিত্র পতাকা জাহাজের মাস্তুলে টাঙ্গানো হলো। ডন জনের নৌবহরে ছিলো দুইশ' পঁচাশিটি রণপোত। পবিত্র পতাকা উড্ডীন হওয়ার সাথে সাথেই বীর জওয়ানদের মধ্যে জযবা পয়দা হলো।

মোটকথা, খৃস্টান ঐক্যবহর এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুর্কী নৌবহরের মুকাবিলায় যাত্রা শুরু করলো। অন্যদিকে, উলূজী পাশার সেনাপত্যে দুইশ' আটটি রণপোতসম্বলিত তুর্কী নৌবহরটিও এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাগরবক্ষে সারিবদ্ধ হলো। তুর্কী নৌসৈন্যের সংখ্যা ছিলো মোট পঁচিশ হাজার।

সাগরবক্ষে দুই বাহিনীর পাঞ্জালড়া শুরু হলো। একদিকে খৃস্টান ঐক্যবহর। আর অন্যদিকে সিরফ তুর্কী নৌবহর। খৃস্টান ঐক্যবহর প্রথমেই প্রবল আক্রমণ করলো। তুর্কীরা অসমশক্তির জওয়াব দিলো। খৃস্টান সেনাদল বীরবিক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলো। আর তুর্কী নৌবহর তাদের পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছিলো। উভয়পক্ষের বহু রণপোত নিমজ্জিত ও নৌসৈন্য নিহত হলো। উলূজী পাশার সহকারী আলী পাশাও এই সংঘর্ষে শহীদ হলেন।

এরপর ডন জন অব অস্ট্রিয়া ও ঐক্যবহরের লোকেরা উলূজী পাশার অবশিষ্ট রণপোতগুলো ঘিরে ফেললো। তুমুল সংঘর্ষের পর তুর্কী নৌবহরের পতন ঘটলো। কিন্তু এই নৌবিজয়ে খৃস্টানদের জানমালের বিপুল ক্ষতি হলো।

এই যুদ্ধ বাহ্যত তুর্কী নৌবহরকে চিরতরে খতম করে দিলো এবং দৃশ্যত তুর্কী নৌশক্তি চিরদিনের মতো ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। বহু রণপোত নিমজ্জিত ও শত্রু

কবলিত হলো। হাজারো নৌসৈন্য শহীদ হলেন। উলূজী পাশা পরাস্ত হয়ে কোনো মতে কনস্টান্টিনোপল ফিরে এলেন।

হাজার হাজার তুর্কী বাহাদুর শহীদ হলেও কিন্তু এই বীর জাতি হতাশ্বাস হলেন না। তাঁরা নবোদ্যমে নৌবহর গঠনে নিয়োজিত হলেন। সত্য বলতে কি, কোনো বাহাদুর কওমই জীবনের কোনো বিপর্যয়ে হতোদ্যম হন না। তাঁরা নীচে নামেন ওপরে ওঠার জন্যে।

যা হোক, এই বিরাট ক্ষতি সামলে উঠতে মাত্র দুটি বছর ব্যয়িত হলো। তৃতীয় বছর উলূজী পাশা তুর্কী নৌবহরকে তিউনিস নিয়ে চললেন। তিউনিস যাত্রাকালে তাঁর নৌবহরে দুইশ' পঞ্চাশটি রণপোত ও ত্রিশটি রণতরী ছিলো।

তিউনিসকে ডন জন অব অস্ট্রিয়া তুর্কী শাসন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু উলূজী পাশা এই পাঁচ বছর পর তিউনিস আক্রমণ করলেন। তিনি অতি সহজেই তিউনিস পুনর্দখল করে সুলতান তৃতীয় মুরাদকে খবর পাঠালেন।

তিউনিস বিজয়ের পর তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে নৌযুদ্ধ বেধে গেলো। উলূজী পাশা কাস্পিয়ান সাগরে ইরানীদের পরাস্ত করলেন। ইরান সরকার সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে জর্জিয়া, তীবরীয ও কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর তুর্কী অধিকারে এলো।

এরপর আলাল্ উলূজী পাশা ইন্তিকাল করেন। তাঁর লকব ছিলো মুআয্যিন্যাদা। তিনি তুরস্ক সরকারের ভূমধ্যসাগরীয় আমীরুল বহর ছিলেন। তাঁর নৌ-ক্রিয়াকাণ্ড খায়রুদ্দীন পাশার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। তুরগুত পাশার মতো নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। তাঁর নৌ-আক্রমণে দুশমনের নাভিশ্বাস উঠে যেতো। তুর্কী আমীরুল বহরদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো বাহাত্তর বছর। তিনি সর্বদা সৈনিক জীবন-যাপন করতেন এবং সমকালের শ্রেষ্ঠ মীরবহর ছিলেন। তোমরাও বড় হয়ে উলূজী পাশার মতো খ্যাতিমান হও। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন!

আমীরুল বহর মুরাদ-ই-আ'জম

আমীরুল বহর মুরাদ-ই-আ'জম আলজিরিয়ার শেষ আমীরুল বহরদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, অভীক ও অটলপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর আজীমুশ্‌শান নৌ-কীর্তিকাণ্ডের দরুন আলজিরীয়বাসীরা তাঁকে মুরাদ-ই-আ'জম উপাধিতে ভূষিত করেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

মুরাদ-ই-আ'জম আলজিরিয়ার শেষ আমীরুল বহরদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, অভীক ও অটলপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর শিরা-উপশিরায় ইউরোপীয় শোণিতধারা প্রবাহিত ছিলো। তিনি আলবানিয়ার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আলজিরিয়ার গভর্নর মুস্তাফা পাশার গৃহে প্রতিপালিত হন। বারো বছর বয়সেই তিনি তাঁর প্রতিপালক ও মুরব্বীর কাছে স্বীয় বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন।

মাল্টার নৌ-অবরোধকালে তিনি মুস্তাফা পাশার অনেক কাজে লেগেছিলেন। যুদ্ধচলাকালে সমুদ্রময় গোয়েন্দাবৃত্তি চালিয়েছিলেন। তাঁর ছোট্ট নৌকাটি প্রস্তরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিলো। কিন্তু নিজের এই অযোগ্যতা ও অনভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর মুরব্বীকে জানতে দিলেন না।

তিনি তৎক্ষণাৎ চুপিসারে আলজিরিয়ায় গিয়ে পৌছেন এবং আরেকটি তরণী সংগ্রহ করে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। অনভিজ্ঞ ও নব্য শিক্ষিত বারবার নৌসেনারা স্পেন উপকূলকে প্রশিক্ষণকেন্দ্র বানিয়েছিলেন। কতকটা এ কারণে যে, এ স্থানটি ছিলো আলজিরীয় উপকূল সংলগ্ন। আর কতকটা এ জন্যে যে, মাল্টাবাসীদের ন্যায় স্পেনবাসীরাও সর্বদা বারবারদের পিছে লেগে থাকতো।

যা হোক, মুরাদ-ই-আ'জম তাঁর এই ছোট্ট তরণী দ্বারা প্রায় দেড়শ' লোক গ্রেফতার করেন। অনুরূপ উলূজী পাশা যখন ক্রুশেডনায়ক সেন্ট ক্রেমেন্টকে আক্রমণ করে তাঁর জাহাজ পাকড়াও করেছিলেন, তখন মুরাদও তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

একবার পনেরোশ' আটাত্তর খৃস্টাব্দে মুরাদ-ই-আ'জম আটটি শিকারী নৌকাসহ কালবিরিয়ার সন্নিকটে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দূর আকাশের নীলাভ কোণে সিসিলীর জাতীয় পতাকা ভেসে উঠলো। কাছে আসতেই প্রতীয়মান হলো, পতাকাধারী একটি আরোহী। জাহাজযোগে নওয়াব টেরা নেভাদা তাঁর সঙ্গী সহচর সমভিব্যাহারে পোপের দরবার যিয়ারত করতে যাচ্ছিলেন। বারবারী কিশ্‌তী দেখা মাত্রই সিসিলীর নিশানবাহক হতবুদ্ধি হয়ে পিঠটান দিলো। কিন্তু মুরাদ-ই-আ'জম ত্বরিতবেগে অগ্রসর

হয়ে জাহাজটিকে পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। নওয়াব টেরা নেভাদা সম্মুখভাগ দিয়ে পলায়ন করলেন।

বারবারদের কোনো কাপ্তান তখন পর্যন্ত সমুদ্র অভ্যন্তরে সফর করেছিলেন না। বরং সচরাচর তীরভূমির কাছাকাছি থাকতেন। কিন্তু মুরাদ-ই-আ'জম একবার কৃষ্ণসাগরের এতো দূর অভ্যন্তরে চলে যান যে, তীর ভূমি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো। পথিমধ্যে পশ্চিম আফ্রিকীয় কেযী দ্বীপপুঞ্জের লিন্‌যারোট দ্বীপ আক্রমণ করে শহর ও গভর্নরের মহল লুট করে নিয়ে আসেন।

অনুরূপভাবে পনেরোশ' উনানব্বই খৃষ্টাব্দে একবার মাল্টার নিকটে চক্কর দেওয়ার সময় তিনি কোনো এক ইউরোপীয় গোত্রের দু'তিনটি সওদাগরী জাহাজ পাকড়াও করে আলজিরিয়া নিয়ে আসেন। ওদিকে মাল্টার নৌদস্যুরা দু'টি তুর্কী জাহাজ ছিনতাই করে মাল্টার দিকে নিয়ে আসছিলো, পথে তাদের সাথেও মুকাবিলা হয়।

সেকালে ক্রুশেড পতাকা ছিলো নাবিকদের জন্য মৃত্যু পরওয়ানাস্বরূপ। কিন্তু মুরাদ-ই-আ'জম ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি নির্ভয়ে শত্রুর জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যেমনিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঈগল তার শিকারের ওপর। শত্রু জাহাজ কব্‌যা করে একটু সামনে এগোতেই মেজরকা দ্বীপের ডাকু নৌশ্রেণীর সম্মুখীন হন। তিনি সেগুলোও বগলদাবা করে বিজয়ীবেশে আলজিরীয় বন্দরে প্রবেশ করেন।

মুরাদ-ই-আ'জমের এই রাজকীয় বিজয়ের দরুন আনন্দোৎসব পালিত হয়। আলজিরিয়া আলোকসজ্জিত হয়। আলজিরীয়বাসিগণ মুরাদকে আ'জম (মহান) খিতাব দিয়ে আমীরুল বহর নিযুক্ত করেন।

আমীরুল বহর হওয়ার পর মুরাদ-ই-আ'জম জাহাজ চালনায় চরম উৎকর্ষ সাধন করেন।

পনেরোশ' ছুরানব্বই খৃষ্টাব্দে মুরাদ-ই-আ'জম চারটি হালকা তরণীসদৃশ জাহাজসহ সমুদ্র ভ্রমণে বের হন। পথে তিনি কতিপয় ইউরোপীয় দস্যু জাহাজ দেখতে পান। তিনি সহসা তাঁর জাহাজের মাস্তুল নামিয়ে আলাদা করে ফেলেন। দস্যু জাহাজগুলো ভাবলো, ওগুলো সওদাগরী জাহাজ। তারা সহর্ষে সেদিকে ধাবিত হলো।

দস্যু জাহাজ বেশি নিকটবর্তী না হতেই মুরাদ-ই-আ'জম সহসা সেগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মুসলমান গোলাম ও খালাসীদের মুক্ত করে খৃষ্টান কাপ্তান ও কর্মকর্তাদের বন্দী করেন।

মুরাদ-ই-আ'জম ভূমধ্যসাগরে তুর্কী নৌ-বহরকে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করেন। তিনি খৃষ্টীয় নৌবাহিনীর সাথে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত ও কৃতকার্য হন।

মুরাদ তিরাশি বছর বয়ক্রমে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি এক আদর্শ জীবনের অধিকারী ছিলেন। মুসলিম তরুণদের জন্যে তাতে অনেককিছু শেখার আছে।

একটি বারো বছরের খৃষ্টান বালক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নৌসেনায় পরিণত হলো। আলজিরিয়ার গভর্নর তাকে পালকপুত্ররূপে বরণ করলেন। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তাকে গোয়েন্দাকার্যে নিয়োগ করলেন।

এই বীর, তেজস্বী ও নির্ভীক নও-জওয়ান যে বিক্রমের সাথে স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত শুধু ইসলামী ইতিহাসই নয়। বিশ্ব-ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া ভার।

এ ছিলো ইসলামের বরকত ও আশীর্বাদ। সে বহু অজ্ঞাত-অখ্যাত লোককেও স্বীয় পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করেছে। উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। এটা ইসলামেরই মহত্ত্ব। ইসলামেরই ঔদার্য। তোমরাও মুসলমান! তোমরাও ইসলামের ছত্রছায়ায় লালিত। বর্ধিত। তোমরাও চেষ্টা করো। পরিশ্রম করো। তাহলে তোমরাও মুরাদ-ই-আ'জমের মতো আমীরুল বহর হতে পারবে। পরিশ্রমীদের আল্লাহ্ও সাহায্য করেন।

বাইশ

আমীরুল বহর সাইয়িদী আলী রঈস

আমীরুল বহর সাইয়্যিদী আলী রঈস স্বীয় নৌবহর ও নৌ-কর্মকাণ্ডের দরুন প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সমগ্র ইউরোপবাসী আমীরুল বহর আলী রঈসের নামে তটস্থ ছিলো। আর দক্ষিণ ইউরোপে তো তিনি তুর্কী নৌবহরের একাধিপত্যই কায়েম করেছিলেন।

– জনৈক ঐতিহাসিক

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাইয়িদী আলী রঈস নামক এক প্রখ্যাত আমীরুল বহর আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি নৌযুদ্ধ ও জাহাজ পরিচালনায় খায়রুদ্দীন পাশা বারবারোসার সমকক্ষ এবং ইউরোপীয় এক বিখ্যাত খৃষ্টান পরিবারের নও-মুসলিম কাপ্তানের পুত্র ছিলেন।

আলী রঈস নৌযুদ্ধ ও জাহাজ চালনার ট্রেনিং লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করে ষোলটি জাহাজের এক নৌবহরসহ দওলত-ই-উছমানিয়ার নৌ-বিভাগে চাকরি নেন। সুলতান তাঁকে তাঁর সুখ্যাতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমীরুল বহর নিযুক্ত করেন। এরপরই তাঁর কীর্তিকাণ্ডের স্বর্ণদ্বার খুলে যায়।

ষোলশ' আটত্রিশ খৃষ্টাব্দে আলী রঈস তুর্কী নৌবহর দ্বারা ইটালীর পূর্ব উপকূল আক্রমণ করে আপুলিয়া প্রদেশের নকোত্রা লুট করেন।

এখানকার বিজয়পর্ব সম্পন্ন করে তিনি এ্যাড্রিয়াটিক সাগরে প্রবেশ করেন এবং কেট্রো উপসাগরের সন্নিকটে এক স্পেনীয় নৌবহরে হামলা করে সেগুলো দখল করেন। ভেনিসে যখন আলী রঈসের এই সামুদ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের খবর পৌছলো তখন ভেনিস সরকার আলী রঈসকে দমনকল্পে সেনাপতি ক্যাপেলুর নেতৃত্বে এক বিরাট নৌবহর প্রেরণ করলেন।

ভেনিসীয় নৌবহর আলী রঈসের ওপর হামলা করলো। আলী রঈস আত্মরক্ষাকল্পে আলবানিয়ার ভিলোনা নামক তুর্কী দুর্গে আশ্রয় নিলেন। সেনাপতি ক্যাপেলু প্রচণ্ড আঘাত হেনে তুর্কী জাহাজগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করলেন।

এর প্রতিশোধ মানসে কনস্টান্‌টিনোপল থেকে এক শক্তিশালী তুর্কী নৌবহর এসে সেনাপতি ক্যাপেলুকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করলো।

এই নৌযুদ্ধে আলী রঈসের নৌবহরের এক বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দওলত-ই-উছমানিয়া তাঁর জন্যে একটি নতুন নৌবহর তৈয়ার

করলেন। এই নৌবহরে নতুন-পুরান মিলে মোট পঁয়ষট্টিটি জাহাজ ও ত্রিশ হাজার নৌসেনা ছিলো।

এই নৌবহরের বদৌলতে তিনি বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় মীরবহররা আলী রঈসের নামে সন্ত্রস্ত ছিলো। দক্ষিণ ইউরোপে তো তিনি তুর্কীদের নৌ-একাধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলী রঈস তাঁর নৌসেনাদের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি ভূমধ্যসাগরের সকল নৌবন্দর সংলগ্ন স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহে নৌসেনাদের চিত্তবিনোদনহেতু অনেক বালাখানা নির্মাণ করেছিলেন। এইসব বালাখানার চতুর্দিকে সেব গাছ লাগানো হতো। সেব গাছের সবুজ ডালপালা বালাখানার জানালা পর্যন্ত এসে পৌঁছতো।

আমীরুল বহর আলী রঈস ছিলেন একজন পূর্ণ আদর্শ নৌসেনানী। তিনি তাঁর নৌসেনা ও খালাসীদের সাথে অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ও নম্র ব্যবহার করতেন। অধীনদেরকে সর্বদা 'হযরত' বলে সম্বোধন করতেন। তাদের দুঃখ-কষ্টকে নিজের দুঃখ-কষ্ট বলে মনে করতেন।

তাঁর কথা ও কাজে কখনো অমিল হতো না। তিনি নিজেও বলতেন--"আমার কথাই আমার কাজ।" বন্দীদের সাথে নিহায়ত কোমল ও সদয় ব্যবহার করতেন।

এই অকুতোভয় বাহাদুর ও অমিতপরাক্রম সিপাহ্সালার ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড দ্বারা উত্তরসুরিদের এমনভাবে পথ-প্রদর্শন করে গেছেন, যেমনিভাবে মহাসমুদ্রে অন্ধকার রাতে পথভ্রষ্ট জাহাজসমূহকে আলোকস্তম্ভ পথ-প্রদর্শন করে থাকে।

তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এই বীর আমীরুল বহরকে স্বীয় চলার পথের আলোকবর্তিকারূপে গ্রহণ করা এবং সমুদ্রের তরঙ্গময় জীবনের সাথে খেলা করতে শেখা। স্থল ও নৌশক্তিতে পারদর্শিতা লাভের মধ্যেই জাতির গৌরবময় জীবন নিহিত। তোমরাও পারদর্শী হও।

আমীরুল বহর পিয়ালে পাশা

আমীরুল বহর পিয়ালে পাশার প্রাথমিক জীবনের ওপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সাধারণ নৌসেনা মাত্র। অতঃপর তিনি কাপ্তানে উন্নীত হন এবং কাপ্তানের পর ক্রমান্বয়ে আমীরুল বহর পদ অলঙ্কৃত করেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

পিয়ালে পাশা প্রথমদিকে একজন সাধারণ নৌসেনা ছিলেন। সুলায়মান-ই-আ'জম তাঁকে নৌ-বিভাগে কাপ্তান পদে উন্নীত করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি আমীরুল বহর পদে অধিষ্ঠিত হন।

দু'শ' খৃষ্টান জাহাজের এক বিশাল নৌবহর ত্রিপোলী বন্দর তুর্কীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাপতি ডোরীয়ার নেতৃত্বে রওয়ানা হলো।

পিয়ালে পাশা তার মুকাবিলাহেতু দাররাই-দানিয়াল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তুরস্কের জেরবা দ্বীপ সমীপে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে খৃষ্টান সম্প্রদায় তাদের সৈন্যদল নামিয়েছিলেন এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন। পনেরোশ' ষাট খৃষ্টাব্দের চৌদ্দই মে পিয়ালে পাশা ডোরীয়ার নৌবহরে জোরদার আক্রমণ করে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন।

খৃষ্টান পক্ষের প্রায় পঞ্চাশটি জাহাজ ধ্বংস ও সাতটি ধৃত হলো। যেসব সৈন্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলো, পিয়ালে পাশা তাদেরও গ্রেফতার করলেন। জেরবায় তুর্কী পতাকা পুনরুত্থিত হলো।

এই বিজয়ের পর পশ্চিম আলজিরিয়ায় অবস্থিত উরণ প্রদেশে হামলা চালিয়ে তাকেও উছমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

পনেরোশ' পঁয়ষট্টি খৃষ্টাব্দে যখন তুর্কী নৌবাহিনী মাল্টা আক্রমণ করেন, তখন তার কর্তৃত্বও ছিলো পিয়ালে পাশার করপুটে। অর্থাৎ পিয়ালে পাশাই ছিলেন তখন তুর্কী নৌবহরের আমীরুল বহর।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে স্পেনের পর যে দেশটি মুসলমানদের বেশি ক্ষতি করেছে, তা ছিলো পর্তুগাল। স্পেনে যখন ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছিলো তখন পর্তুগালও তার আওতাধীন ছিলো। কিন্তু এই ভূখণ্ডে যখন মুসলমানদের ভাগ্যরবি অস্তমিত হয় এবং স্পেনের খৃষ্টান সরকার মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে, তখন পুর্তগাল মুসলমানদের নিকট থেকে তার মনের বাসনা চরিতার্থ করলো।

অর্থাৎ–হিন্দুস্তান, চীন, জাভা, সুমাত্রা, ভারত দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, মালাবার, মম্বাসা যাঞ্জিবার, ইথিওপিয়া, মিসর ও আরব প্রভৃতি অঞ্চলের সমুদয় ব্যবসা-বাণিজ্য আরব বণিকদের অধিকারে ছিলো। এক্ষণে সুযোগ বুঝে পর্তুগীযরা আরব বণিকদের হাত থেকে এই নৌপথগুলো কেড়ে নিলো।

আরব বণিকগণ প্রাচ্য দেশের পণ্যদ্রব্য জাহাজযোগে মিসরে নিয়ে যেতো এবং সেখান থেকে ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজ এইসব মালামাল ভেনিস ও জেনোয়ায় পৌছে দিতো। অপরদিকে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য বহন করে আরব বণিকরা চীন দেশে পৌছে দিতো। এই নৌ-বাণিজ্যে মুসলমানদের অনেক অর্থাগম হতো। কিন্তু ভাস্কোডা গামার ভারত আবিষ্কারের পর পর্তুগীযরা মুসলমানদের হাত থেকে এই সুবিধা চিরতরে ছিনিয়ে নেয়ার সঙ্কল্প করলো।

সুতরাং এই লক্ষ্যে পর্তুগীযরা আচানক মুসলিম নৌবহরে হামলা শুরু করলো। এমনকি ভারত ও ইরানেও আক্রমণ করলো। শুধু তাই নয়, তারা অমুসলিমদেরকে তাদের পণ্যদ্রব্য মুসলমানদের নিকট বিক্রয় না করতেও বাধ্য করলো।

মালাবারের মোপ্‌লা বণিকদের ওপর ঘোর নির্যাতন চালালো। য়ামন ও হিজাযের উপকূলীয় শহরগুলো কব্‌যা করলো। ভারতীয় নদী বন্দরগুলোর ওপর-অর্থাৎ সিন্ধু থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজ পর্যন্ত উপকূলীয় মুসলমানদের ওপর চড়াও হলো।

ভারতীয় উপকূল ও দ্বীপপুঞ্জে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালালো। মসজিদসমূহ ভেঙ্গে গির্জায় রূপান্তরিত করলো। কালিকটের অসাম্প্রদায়িক রাজাকে তাঁর এলাকায় মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য করা হলো। কোচীনের তীরভূমি দখল করে মুসলমানদের কতল করলো।

এরপর পর্তুগীযরা আরব উপকুলবর্তী এডেন ও হরমুয আক্রমণ করলো। কালিকট শহর লুণ্ঠন করে স্থানীয় জামে মসজিদ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করলো। আরব উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লুটতরায অব্যাহত রাখলো। হজ্জযাত্রীরাও এই দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পেলো না।

গোয়ার বিখ্যাত নৌবন্দর বিজাপুর সুলতানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো। গুজরাটরাজের বন্দরসমূহে লুটপাট শুরু করলো। পুর্তগীযরা জেদ্দা দখল করে হিজায আক্রমণের স্বপ্ন দেখছিলো। এমনকি মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করে (তওবা তওবা) এ দুটি শহরকেও ধ্বংস করতে চাচ্ছিলো।

এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে মুসলিম মিল্লাতের অধিপতি হিসেবে সুলায়মান-ই-আ'জম এগিয়ে এলেন এবং পর্তুগীযদের এহেন অত্যাচার থেকে মুসলমানদের উদ্ধার

মানসে কতিপয় নৌবহর প্রেরণ করেন। মহান পিয়ালে পাশা ও সুলায়মান পাশা ছিলেন এইসব নৌ-বহরের আমীরুল বহর।

তুর্কী নৌবহর এডেন অবরোধ করলো। পর্তুগীযরা এডেনে শিকড় গেড়েছিলো। তাই এ যাত্রা তুর্কীদের পরাজয় ঘটলো। তবু তারা অতি বীরত্বের সাথে অবিচল রইল। ভারত সাগরে পুর্তগীযদের ঠেলতে ঠেলতে গুজরাট উপকূল পর্যন্ত পৌছে গেলো। এখানে তুর্কী ও পর্তুগীয নৌবহরে কয়েক দফা লড়াই হলো।

এদিকে তুর্কী নৌবহরের সাহায্যার্থ এক বিরাট নৌবহর মিসর অধিনায়ক সুলায়মান পাশার নেতৃত্বে সুয়েযখাল থেকে রওয়ানা হলো এবং এডেন কব্‌যা করে গুজরাটে পৌছলো। মালদ্বীপ পৌছে পাশা গুজরাটীদের সহযোগে পর্তুগীযদের আক্রমণ করলেন।

সুলায়মান পাশা মালদ্বীপ অবরোধ করলেন। তিনি যদি দৃঢ়চিত্তে এই অবরোধ অব্যাহত রাখতে পারতেন, তবে নির্ঘাত পর্তুগীযদের হাত থেকে বন্দরটি রক্ষা পেতো। কিন্তু ইত্যবসরে কোনো এক ব্যাপারে গুজরাট নেতাদের সাথে সুলায়মান পাশার মতান্তর ঘটলে তাঁরা-তুর্কী বাহিনীকে রসদ প্রেরণ বন্ধ করে দেন। ফলে একদিন তুর্কী নৌবাহিনী নোঙ্গর তুলে চলে গেলেন এবং মালদ্বীপ পূর্বের মতোই পর্তুগীযদের দখলে রইলো।

সুলায়মান-ই-আ'জম এই সংবাদ শ্রবণ করে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন। তিনি আমীরুল বহর সুলায়মান পাশাকে দরবারে ডেকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেনঃ "আমি তোমাকে মালদ্বীপ থেকে পর্তুগীযদের উৎখাতকল্পে গুজরাটরাজের সাহায্যার্থ পাঠিয়েছিলাম-হিন্দুস্তানী মুসলমানদের ওপর শাসনকর্তা করে পাঠাইনি!"

পিয়ালে পাশাও এই ব্যপদেশে পুর্তগীযদের সাথে কয়েক দফা নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কখনো কৃতকার্য হয়েছেন, আবার কখনো ব্যর্থকাম। সুলায়মান পাশার ভ্রান্তির পর সুলায়মান-ই-আ'জম তাঁর সমস্ত আমীরুল বহর রদবদল করেন। এবার পীরী রঈস নতুন আমীরুল বহর নিযুক্ত হন। তিনি পর্তুগীযদের চূড়ান্তরূপে পর্যুদস্ত করেন।

পিয়ালে পাশার প্রাথমিক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন নিতান্ত একজন সাধারণ নৌসৈন্য। অতঃপর তিনি কাপ্তানে উন্নীত হন। কাপ্তানের পর ক্রমে ক্রমে আমীরুল বহরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

তোমরাও নও-জওয়ান। তোমাদের মধ্যেও পিয়ালে পাশার মতো সাফল্য ও উন্নতির উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু সাফল্যকে রূপদান করতে প্রয়োজন অনলস প্রচেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ-উদ্যম।

চব্বিশ

আমীরুল বহর পীরী রঈস

আমীরুল বহর পীরী রঈস নিছক একজন আমীরুল বহরই ছিলেন না, একজন প্রখ্যাত ভূগোলবিদও ছিলেন। ভূগোলবিদ হিসেবে তিনি ঠিক ততখানিই সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন, যতখানি লাভ করেছিলেন আমীরুল বহর হিসেবে।

— জনৈক ঐতিহাসিক

তুর্কী নৌবহরকে ভারত মহাসাগরে পরাস্ত করার পর পর্তুগীযদের শক্তি-সাহস এতোই বেড়ে যায় যে, তারা দ্বিতীয়বার এডেন বন্দরটি দখল করে নিলো এবং হিজাযের বন্দর নগরী জেদ্দার ওপরও ক্রুদ্ধ ছোবল হানার তোড়জোড় শুরু করলো।

জেদ্দা কব্‌যা করার পর মুসলমানদের প্রতি প্রতিহিংসাবশত তারা খানা কা'বা বিধ্বংস এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা মুবারক বিনষ্ট করার (তওবা তওবা) ফন্দি আঁটছিলো। এই অভিসন্ধি প্রতিরোধকল্পে পর্তুগীযদের সাথে লড়াই করার লক্ষ্যে সুলায়মান-ই-আ'জম পীরী রঈসকে এক বিরাট শক্তিশালী তুর্কী নৌবহরসহ ভারত মহাসাগরে প্রেরণ করেন। আমীরুল বহর পীরী রঈস পুর্তগীযদের ওপর হামলা করে এডেন বন্দর পুনরুদ্ধার করেন এবং এডেন বন্দরের নিরাপত্তাহেতু এক বিরাট নৌবহর মোতায়েন করেন।

এডেন মুক্ত করার পর তিনি আরব উপকূল ঘেঁষে এগোতে এগোতে মাস্‌কাত বন্দরে পৌছেন। মাস্‌কাতে পর্তুগীয নৌবাহিনী নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। পীরী রঈস তাদেরও পাকড়াও করলেন। অতঃপর তিনি মাস্‌কাত থেকে অগ্রসর হয়ে পারস্যোপসাগর উপকূলে পুর্তগীযদের পর্যুদস্ত করে হরমুয পৌছেন। এখানে পর্তুগীযদের সাহায্যার্থ কিছু নতুন সৈন্য এসে যোগ দিলো। ফলে পীরী রঈস পরাস্ত হলেন। পীরী রঈস মাত্র দুটি নৌ-জাহাজ শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারলেন। বাকী সব গ্রেফতার হলো।

পীরী রঈস নিছক একজন আমীরুল বহরই ছিলেন না, একজন যবরদস্ত ভূগোলবিদও ছিলেন। তিনি ভূগোলবিদ হিসেবে ঠিক ততখানিই সুবিখ্যাত ছিলেন, যতখানি সুবিখ্যাত একজন আমীরুল বহর হিসেবে। তিনি ঈজীয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ঐ দু'টি সাগরের স্রোতধারা আশপাশের পরিবেশ, নৌবন্দর ও তীরে ওঠার উপযুক্ত স্থানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

আমীরুল বহর পীরী রঈস তাঁর অধিকাংশ নৌ-অভিযানই ভূমধ্যসাগর ও ঈজীয়ান সাগরে চালিয়েছিলেন।

পীরী রঈসের পরাজয়ের খবর শুনে সুলায়মান-ই-আ'জম আমীরুল বহর মুরাদ-ই-আ'জমকে প্রেরণ করেছিলেন। যাঁর পরিচয় তোমরা পূর্বেই পড়ে এসেছো।

মুরাদ-ই-আ'জম তুর্কী নৌবহর উদ্ধারকল্পে হরমুয উপসাগরের সামনে পর্তুগীযদের মুকাবিলা করেন। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি।

পীরী রঈস একযুগ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে আমীরুল বহর ছিলেন এবং পরিশেষে সত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁর পশ্চাতে গৌরবজনক নৌসৈনাপত্য ও ভৌগোলিক ক্রিয়াকাণ্ড রেখে গেছেন।

আমীরুল বহর হাসান পাশা

আমীরুল বহর হাসান পাশা তুর্কী আমীরুল বহরদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি জাহাজের কর্মচারীদের শাস্ত্রীয় শিক্ষাদানকল্পে নৌ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তুর্কী ভাষায় নৌ-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের তরজমা করান এবং তুর্কী নও-জওয়ানদের মধ্যে নৌবিদ্যার উৎসাহ সৃষ্টি করেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

সুলতান প্রথম আবদুল হামীদের আমলে রুশ ও তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিলো। তুর্কী সাম্রাজ্যের ফৌজী শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসছিলো। সুলতান রুশদের সাথে সন্ধি করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাইলেন। তাই সতেরোশ' চুয়াত্তর খৃষ্টাব্দের ষোলই জুলাই কেনার্জী নামক স্থানে দুই সরকারের সামরিক প্রতিনিধিদের এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'কেনার্জী চুক্তি' নামে খ্যাত।

তুর্কীদের মধ্যে এই সন্ধি-চুক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। তারা রাশিয়ানদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লো। কিন্তু তুর্কীদের মধ্যে একটি জামা'আত জাতিকে এই অধোপাতের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলেন। তাঁরা যে-কোনো মূল্যে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তায় তুর্কী সালতানাতের সেবায় নিয়োজিত রইলেন। পরাজয়, অধঃপতন ও তীব্র কশাঘাত সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্কল্প থেকে তাঁরা এতোটুকু বিচ্যুত হলেন না।

এই জামা'আতের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ ও অগ্রনায়ক ছিলেন আলজিরীয় হাসান পাশা। তাঁর ওপর সুলতান আবদুল হামীদ ও তুর্কী জাতির পূর্ণ ভরসা ছিলো।

তুর্কী সুলতান হাসান পাশাকে অগাধ ক্ষমতা দান করেছিলেন। হাসান পাশা একদিকে স্থলবাহিনীর সিপাহ্সালার ও অন্যদিকে নৌবাহিনীর আমীরুল বহর।

তিনি স্থল ও নৌবাহিনীকে পুনর্গঠন করার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু স্থলবাহিনীর ক্ষেত্রে কৃতকার্য হতে পারলেন না।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারবশত স্থলবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও টেকনিক ব্যবহারে অসম্মত হলো। অবশ্য নৌ-বিভাগের সংস্কার সাধনে হাসান পাশার প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হলো।

হাসান পাশা জনৈক ইংরেজ জাহাজ মিস্ত্রী দ্বারা নতুন ধরনের যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করালেন। আলজিরিয়া, এ্যাড্রিয়াটিক সাগর ও বারবারী রাজ্যসমূহে যতো ভালো ভালো মাঝিমাল্লা, নাবিক ও জাহাজ মিস্ত্রী পাওয়া গেলো তিনি তাদের সবাইকে কনস্টান্টিনোপল ডেকে পাঠিয়ে নৌকার্যে নিয়োগ করলেন।

হাসান পাশা নিজেও একজন দক্ষ নাবিক ছিলেন। তিনি জাহাজ চালনা ও জাহাজ নির্মাণের গুরুত্ব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তাই এই শিল্পের প্রতি তাঁর অন্তরের টান ছিলো দুর্নিবার। খালাসীর কাজ থেকে আরম্ভ করে কাপ্তানের কাজ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং দেখাশোনা করতেন এবং তাদের কৃতকর্মের ভালো-মন্দ দেখিয়ে দিতেন। তিনি জাহাজের কাপ্তানদেরও জাহাজের প্রতি নজর রাখতে বাধ্য করতেন।

তিনি সর্বক্ষণ বিপুলসংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ নাবিক কনস্টান্টিনোপলে রিজার্ভ রাখতেন। এতোদিন নিয়ম ছিলো, শীতকালে জাহাজসমূহ বন্দরে নোঙ্গর করে নাবিকদের বিদায় করে দেয়া হতো। এই নিয়মের ত্রুটি নির্দেশ করে বললেন যে, দেশের রাজধানী এইভাবে অরক্ষিত রেখে দিলে রুশ নৌবহর কৃষ্ণসাগরের বন্দর থেকে বের হয়ে অতি সহজেই বসফোরাস দখল ও তুর্কী নৌবহরগুলোকে তার বন্দরে ধ্বংস করে দিতে পারে।

সুতরাং এই প্রস্তাব অনুসারে দওলত-ই-উছমানিয়া বসফোরাস উপকূলে নৌছাউনির পত্তন করেন এবং নৌবাহিনীর সুবিধার্থে কতিপয় ব্যারাক নির্মাণ করেন। এইসব ব্যারাকে জাহাজের নাবিকরা শীতকালে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতেন।

তুর্কী আমীরুল বহরদের মধ্যে হাসান পাশা প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি জাহাজের কর্মচারীদের শাস্ত্রীয় শিক্ষাদান মানসে একটি নৌ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তুর্কী ভাষায় নৌ-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ তরজমা করান এবং তুর্কী তরুণদের মধ্যে নৌবিদ্যার উৎসাহ সৃষ্টি করেন।

তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। তাই যত্রতত্র বিদ্রোহ দানাবেঁধে উঠছিলো। প্রথম বিদ্রোহ করেন সিরিয়ার শায়খ তাহির নামক জনৈক গোত্রপতি। স্থল ও নৌ উভয় বাহিনীই ব্যবহৃত হয়। আক্কা বন্দর অবরোধ করে শায়খ তাহিরকে গ্রেফতার ও বন্দী করা হয় এবং আক্কা বন্দর ও তার পুরো এলাকা কব্‌যা করে হাসান পাশা সেখানে একদল নৌ ও স্থলসেনা নিয়োগ করেন। অতঃপর সতেরোশ' সত্তর খৃষ্টাব্দে তিনি মারীয়া বিদ্রোহ দমন করে সেখানে শান্তি স্থাপন করেন।

কিছুদিন পর মিসরে মামলুকদের বিদ্রোহ শুরু হয়। হাসান পাশা এই বিদ্রোহ দমনের জন্যেও স্থল ও নৌবাহিনী ব্যবহার করেন এবং অচিরেই কায়রো দখল করে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সম্রাজ্ঞী যারীনা ক্যাথারীন। এই মহিলা ভীষণ গোঁড়া ও তুর্কীবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তুর্কী জাতিকে ভূপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলেন। তাই বড় বড় কূটকৌশল ও চক্রান্তজাল রচনা করলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিলো তুর্কীদের ইউরোপ থেকে বহিষ্কার করা। কনস্টান্টিনোপল থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া। কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে বসানোর জন্য তিনি তাঁর পৌত্র যুবরাজ কনস্টান্টাইনকে প্রস্তুত রাখলেন।

যারীনা ক্যাথারীন বিরাট প্রস্তুতির পর তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তুর্কী সুলতান আমীরুল বহর হাসান পাশাকে নৌ ও স্থল বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রদান করে ক্যালবার্ন আক্রমণকল্পে উকাযাকোভ প্রেরণ করেন। ক্যালবার্ন নীটার নদীর মোহনায় উকাযাকোভের বিপরীত তীরে অবস্থিত। ক্যালবার্নে রুশ বাহিনীর প্রখ্যাত সিপাহ্সালার সুভারভ শিবির ফেলে অবস্থান করছিলেন। সুভারভ সমকালের খ্যাতনামা জেনারেল ছিলেন। তিনি তুর্কী ফৌজের অধিকাংশকে বিনা বাধায় নদী পার হতে দিলেন।

অতঃপর এক ঝটিকা আক্রমণে তুর্কী বাহিনীর বৃহদংশের ক্ষতিসাধন করেন। তুর্কী ও রুশ নৌবহরের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। তুর্কী বহরের ঘোরতর ক্ষতি হলো। হাসান পাশার অধিকাংশ নৌ-জাহাজ ধ্বংস ও বিনষ্ট হলো।

এরপর সতেরোশ' সাতাশি সাল পর্যন্ত দুই সরকারের মধ্যে কোনো লড়াই-বিবাদ বাধেনি।

তুরস্ক সতেরোশ;উনানব্বই খৃষ্টাব্দে ইউসুফ পাশার নেতৃত্বে তরতাযা নব্বই হাজার সৈন্য রাশিয়ার মুকাবিলায় চালনা করে। ইউসুফ পাশা একজন মস্ত অভিজ্ঞ তুর্কী সিপাহ্সালার ছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যের কিয়দংশ শত্রুর পশ্চাৎদেশে আক্রমণ পর্যবেক্ষণহেতু রেখে নব্বই হাজার আনকোরা সাহসী সৈন্যসহ দানিয়ুব নদী পার হয়ে ট্রানসিলভেনিয়ায় ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে তিনি অস্ট্রিয়া আক্রমণের উপক্রম করলেন। ইত্যবসরে সতেরোশ' উনানব্বই খৃষ্টাব্দের সতেরোই এপ্রিল সুলতান প্রথম আবদুল হামীদ ইন্তিকাল করেন। ফলে ইউসুফ পাশাকে ফেরত ডেকে পাঠানো হয়। তিনি এই অভিযান অসমাপ্ত রেখে সসৈন্যে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছেন।

প্রথম আবদুল হামীদের পর শাহযাদা তৃতীয় সালীম তখ্তনশীন হন। তিনি তুর্কী সালতানাতকে সুবিন্যস্ত করে স্থল ও নৌবাহিনীকেও শক্তিশালী করার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার অবসর দেয়নি।

এই সময় যারীনা ক্যাথারীনের ইঙ্গিতে অস্ট্রিয়া তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। সুলতান সালীম তাঁর পুরাতন বিদগ্ধ আমীরুল বহর ও সিপাহ্‌সালার হাসান পাশাকে প্রধান সেনাপতি করে পাঠান। হাসান পাশা এক বিরাট বাহিনীসহ অস্ট্রিয়ার সিপাহ্‌সালার শাহ্‌যাদা কোবরগের মুকাবিলায় অগ্রসর হলেন। কোবরগ মলডেভিয়ার সীমান্তে ফকশানী নামক স্থানে শিবির পেতে বিশ্রাম করছিলেন। যদি রাশিয়ার রণদক্ষ সিপাহ্‌সালার সুভারভ কোবরগের সাহায্যে এগিয়ে না আসতেন,তাহলে কোবরগের পরাজয় অবধারিত ছিলো।

রাশিয়ার প্রবীণ সিপাহ্‌সালার সুভারভ মাত্র ছত্রিশ ঘন্টার ব্যবধানে ষাট মাইল দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে যথাসময়ে সাহায্যার্থ পৌঁছে গেলেন।

সুভারভ তুর্কীদের হামলার অপেক্ষা না করে স্বয়ং তুর্কী বাহিনীর ওপর হামলা পরিচালনা করলেন। সুভারভের হামলা ফলবতী হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কীরা পরাভূত হলেন। শত্রুপক্ষ তুর্কীদের সমুদয় যুদ্ধোপকরণ করায়ত্ত করলো।

এই ব্যর্থতার পর সুলতান তৃতীয় সালীম নতুন নতুন সেনাদল পাঠালেন। সতেরোশ' উনানব্বই খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর রমনগ্ নদীর সন্নিকটে জেনারেল সুভারভের সৈন্যরা এই নতুন সৈন্যদেরও পরাজিত করেন।

এই উপর্যুপরি পরাজয়ের দরুন কন্‌স্টান্‌টিনোপলের জনগণ তুমুল হট্টগোল আরম্ভ করেন। তারা এই পরাজয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব সেনাপতি হাসান পাশার স্কন্ধে চাপালেন। তারা সুলতান সকাশে হাসান পাশার শাস্তিও দাবি করলেন।

যে হাসান পাশা দওলত-ই-উছমানীয়ার শুশ্রূষা করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, যিনি উছমানীয় সাম্রাজ্যকে অধঃপাতের হাত থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, তাঁর শত্রুরা তাঁকে কারারুদ্ধ করালো।

আত্মমর্যাদাশীল বীর আমীরুল বহর কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর স্বীয় উজ্জ্বল কর্মকাণ্ড অনাগত মুসলিম তরুণদের জন্যে রেখে যান।

তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এই বীর বাহাদুর সেনাপতির আদর্শে স্বীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। ইসলামের কৃতী সন্তানরূপে নিজেদের গড়ে তোলা। যে জাতির নতুন বংশধররা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়, কেবল তাদেরই সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার আছে। তারাই পারে দুনিয়ায় সসম্মানে জীবন ধারণ করতে।

তোমরাও তোমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করো। স্বীয় পূর্ব পুরুষদের কীর্তিধন্য জীবন থেকে ফায়দা হাসিল করো। আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে।

ছাব্বিশ

আমীরুল বহর কোচক হুসায়ন পাশা

আমীরুল বহর কোচক হুসায়ন পাশা যুদ্ধাস্ত্র পুনর্বিন্যাস করেন। ফ্রান্স ও ইংরেজদের অনুকরণে তুর্কী নৌবহর পুনর্গঠন করেন। নতুন যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করান। তুর্কী তরুণদের কামান ও আধুনিক অস্ত্র নির্মাণ শিক্ষা দেন। ফ্রান্স ও সুইডেন থেকে বিপুলসংখ্যক দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার আমদানী করেন।

— জনৈক ঐতিহাসিক

কোচক হুসায়ন পাশা তৃতীয় সালীমের শাসন আমলে হাসান পাশার পর আমীরুল বহর নিযুক্ত হন। তিনি এক নাগারে দ্বাদশ বছরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তুর্কী নৌ-বিভাগে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নতুনভাবে ঢেলে সাজান। ফ্রান্স ও ইংরেজ নৌ-বহরের অনুকরণে তুর্কী নৌবহরকেও পুনর্বিন্যাস করেন। বহু নতুন জাহাজ নির্মাণ করান। ফ্রান্স ও সুইডেন থেকে অজস্র দক্ষ প্রকৌশলী আমদানী করেন। তাঁরা তুর্কী তরুণদের কামান ও আধুনিক অস্ত্র নির্মাণ শিক্ষা দেন।

সুলতান আবদুল হামীদের আমলে ব্যারন দি তুতের তত্ত্বাবধানে গোলন্দাযদের শিক্ষাদানকল্পে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কোচক হুসায়ন পাশা সেটির মানোন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়া তিনি আরো একটি নৌ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

দুটি বিদ্যালয়কেই তিনি চরমোৎকর্ষ দান করেছিলেন। ফলে তুর্কী তরুণদের মধ্যে নৌবিদ্যা লাভের উদগ্র আগ্রহ জন্মে। মুসলিম নৌবাহিনীর ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

হুসায়ন পাশা নৌবিদ্যা, জাহাজ চালনা, জাহাজ নির্মাণ ও নৌ-বাহিনী সম্পর্কীয় সমুদয় ফ্রান্সিস ও ইংরেজী গ্রন্থের তুর্কী তরজমা করান। নৌবাহিনীতে বিভিন্ন প্রকার পাঠাগার স্থাপন করেন। এইসব গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বই থাকতো। তিনি তাঁর নৌবিদ্যালয়ে ফ্রান্সীয় শিক্ষারও সুব্যবস্থা রাখেন।

এসব সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের পর আমীরুল বহর কোচক হুসায়ন পাশা নৌবন্দর সংস্কার করেন। পোতাশ্রয়গুলো পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করেন।

জাহাজ চালনা কার্যের জন্য ভালো জাহাজ নির্মাণ কারখানা থাকা আবশ্যক। যে জাতির ভালো জাহাজ নির্মাণ কারখানা নেই, সে জাতির জাহাজ চালনা নিরর্থক।

তুর্কী জাতি যাতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ইউরোপীয় কোনো জাতির চাইতে পিছনে পড়ে না থাকে আমীরুল বহর কোচক হুসায়ন পাশা সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি ও বিভিন্ন দ্বীপদেশে জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

এসব কারখানায় বহু পর্বতোপম জাহাজ নির্মিত হতো। খ্যাতনামা প্রকৌশলিগণ দ্বারা কারখানাগুলো পরিচালিত হতো।

আমীরুল বহর কোচক হুসায়ন পাশা ভূমধ্যসাগর ও ঈজীয়ান সাগরকে নৌদস্যু ও তস্করমুক্ত করেন। নৌসৈনাপত্যের দায়িত্ব হাতে নিয়ে তিনি ইউরোপের কুখ্যাত ডাকাত লম্বারো কাজ্ঞিয়ানীকে গ্রেফতার করে তার জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেন।

লম্বারো কাজ্ঞিয়ানীর পর ঈজীয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের খুঁজে খুঁজে বধ করেন। এইসব নৌদস্যু ও লুটেরা-রা শান্তিপূর্ণ সওদাগরী জাহাজে হামলা ও লুটপাট চালাতো। আমীরুল বহর কোচক হুসায়ন পাশা এদেরকে সদলবলে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন।

সেনানায়ক কোচক হুসায়ন পাশা বারো বছরকাল অবধি তুর্কী নৌবাহিনীর পোষকতা করেন। নৌ-বিভাগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন। কিন্তু তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন এসব সংস্কার ও উন্নয়নকে অর্থহীন করে দেয়।

আঠারোশ, চার খৃষ্টাব্দে এই প্রখ্যাতনামা আমীরুল বহর ইহলীলা সংবরণ করেন এবং উত্তরাধিকারস্বরূপ মুসলিম তরুণদের জন্য বহু অক্ষয় কীর্তি রেখে যান।

যে তরুণ সমাজ এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে, তারা বড়ই সৌভাগ্যবান।

ই ফা বা - ৯৩ - ৯৪ - প্র/৩৪২২ (উ) - ৩২৫০